সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

লাল জঙ্গল





লাল জঙ্গল

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বিমলারঞ্জন প্রকাশন
৮/১ সি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
জন্মাষ্টমী ১৩৯২
৭ই নভেম্বর ১৯৮৬

প্রচ্ছদ
গণেশ বসু
অলংকরণ
তাপস দত্ত

মূল্য বার টাকা মাত্র

শ্রীবিমলারঞ্জন চন্দ্র কর্তৃক বিমলারঞ্জন প্রকাশন ৮/১সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা ৭০০০৭৩ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীগোবিন্দলাল চৌধুরী কর্তৃক স্যাঙ্গুইন প্রিণ্টার্স ২নং ছিদাম মুদি লেন কলিকাতা ৭০০০০৬ হইতে মুদ্রিত

উৎসর্গ

শ্রীকার্তিক ঘোষ

প্রীতিভাজনেষু

দুষ্টু

প্রথম যখন এলো এ বাড়িতে, তখন ওর মাত্র দেড় মাস বয়েস। ফুটফুটে চেহারা, জুলজুলে চোখ। যখন এদিক ওদিক দৌড়োয়, তখন মনে হয় ঠিক একটা সাদা বল গড়ালো মাটির ওপর দিয়ে। দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে।

পুপ্‌লুই ওর নাম রাখলো দুষ্টু। ও পুপ্‌লুর নিজস্ব কুকুর। পুপ্‌লুর বাবা তেমন ভালোবাসেন না কুকুর, তিনি প্রথমে আপত্তি করেছিলেন একটু। কিন্তু পুপ্‌লুর মায়ের ইচ্ছে, বাড়িতে একটা কুকুর থাক। পুপ্‌লুর সঙ্গে খেলা করবে।

কয়েকদিনের মধ্যে দুষ্টু সকলের মন কেড়ে নিল। সব সময় পায়ে পায়ে ঘোরে আর ভুকভুক করে ডাকে। কী মিষ্টি ওর ডাকটা। ছোট্ট ছোট্ট দাঁত দিয়ে কুটুস কুটুস করে কামড়ে দেয়, তাতে কিন্তু একটুও লাগে না।

তিনমাস বয়সের সময়ও দুষ্টু তেমন বড় হলো না। প্রায় একই রকম চেহারা। শুধু গলার আওয়াজটা একটু গম্ভীর হয়েছে। বারান্দায় কাক বসলেই সে ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে যায়। কাকগুলোও ভারি চালাক ; তারা বারান্দার এক পাশ থেকে উড়ে গিয়ে আর এক পাশে বসে। কাকেরা দুষ্টুকে ভয় পায় না, তারা ওকে নিয়ে খেলা করে।

সকালবেলা পুপ্‌লু যখন ইস্কুলে যায়, সেই সময় দারুণ ছটফট করে দুষ্টু। সে কিছুতেই থাকতে চায় না। সে বুঝতেই পারে না, পুপ্‌লু তাকে ছেড়ে একলা কোথায় চলে যাচ্ছে। তখন দুষ্টুকে জোর করে ধরে রাখতে হয়। এক-একদিন সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায় অনেকটা।

সাড়ে তিনমাস বয়সের সময় তুষ্টু একদিন পালালো বাড়ি থেকে। পুপ্‌লু ইস্কুলে চলে গেছে, পুপ্‌লুর বাবা বেরিয়ে গেছেন অফিসে, মা রান্নাঘরে ব্যস্ত। এই সময় বাড়ির ঠিকে-ঝি সদর দরজা খোলা রেখেছিল, তুষ্টু টুক করে বেরিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ কেউ খেয়ালই করে নি। পুপ্‌লু বারোটার সময় তুষ্টুর খাবার দিতে গিয়ে খুঁজে পেলো না। রেফ্রিজারেটারের তলাটাই তুষ্টুর লুকোবার প্রিয় জায়গা। সেখানে নেই, বারান্দায় নেই, ছাদে নেই। তা হলে কোথায় গেল ?

পুপ্‌লুর মা ঠিকে-ঝিকে বললেন, 'দেখে এসো তো, সিঁড়ির নীচে বসে আছে কিনা ?'

সেখানেও নেই তুষ্টু।

পুপ্‌লুর মা দারুণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তারপর ঠিকে-ঝিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি নিজেই বেরিয়ে পড়লেন রাস্তায়। একেবারে মোড়ে পানের দোকানের সামনে তিনি দেখলেন, একটা ভিড় জমে আছে। কাছে এসে তিনি দেখতে পেলেন তুষ্টুকে।

সারা গায়ে সাদা সাদা বড় বড় লোম, ছোট্ট-খাট্টো কুকুর, তবু কী তার তেজ! তিনটে রাস্তার কুকুর ঘিরে ধরেছে, তারই মাঝখানে লোম ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে ঘেউ ঘেউ করে ভয় দেখাচ্ছে তুষ্টু। লোকেরা মজা দেখছে।

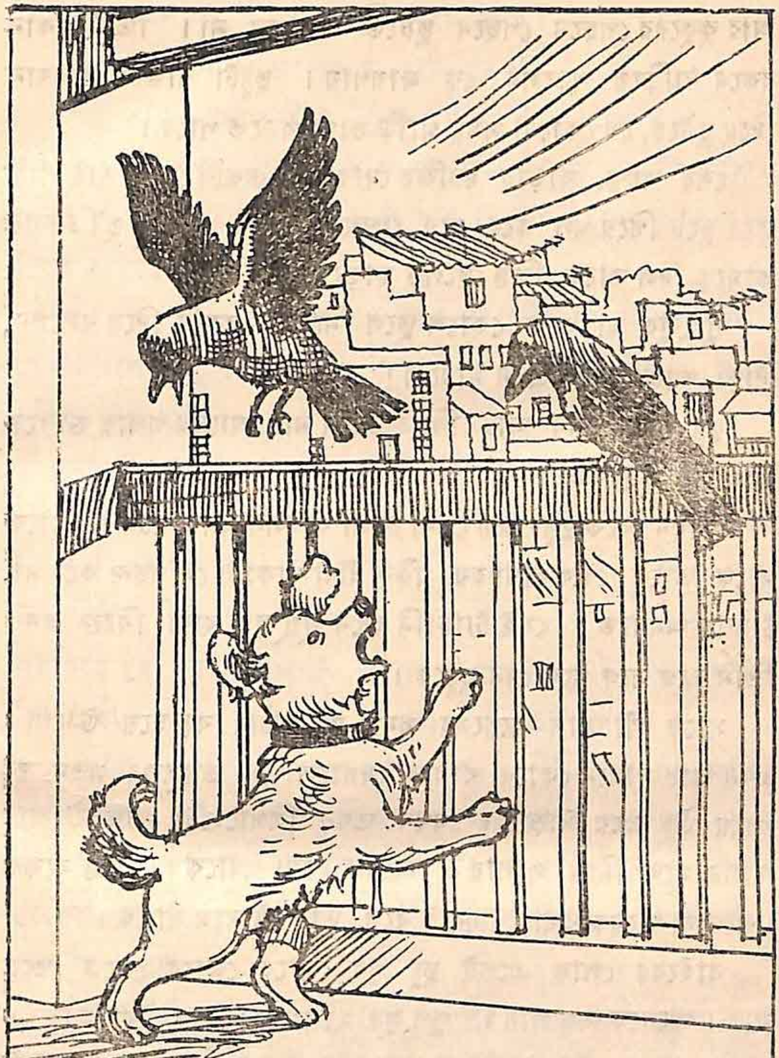
পুপ্‌লুর মা এসে বললেন, 'এই তুষ্টু!'

রাস্তার লোকেরা বললো, 'এটা আপনাদের কুকুর ? তাই বলুন। দেখেই মনে হয়েছিল এটা কারুর বাড়ির পোষা কুকুর।'

পুপ্‌লুর মা হাত বাড়িয়ে তুষ্টুকে কোলে তুলে নিতে গেলেন। কিন্তু তুষ্টুটা এমন পাজী, সে এক লাফ মেরে খানিকটা দূরে সরে গেল। তারপর দৌড়াতে লাগলো পাশের রাস্তা দিয়ে।

লোকেরা চেঁচিয়ে উঠলো, 'ধর, ধর!'

কিন্তু তুষ্টু চলে যেতে লাগলো আরও দূরে। পুপ্‌লুর মা তো



আর কুকুরের পেছনে পেছনে ছুটতে পারবেন না। তিনি কোন রকমে দাঁড়িয়ে পড়লেন এক জায়গায়। দুষ্টুটা রাস্তার মাঝখান দিয়ে ছুটছে, যে কোনো সময় গাড়ি চাপা পড়তে পারে।

শেষ পর্যন্ত, পাড়ার দরজির দোকানের একটা ছেলে পাঁই পাঁই করে ছুটে গিয়ে খপ্ করে ধরে ফেললো দুষ্টুকে। দুষ্টু দু'তিনবার কামড়ে দিল তাকে, কিন্তু ছেলেটি ছাড়লো না।

পুপ্‌লুর মা ওকে কোলে তুলে নিলে। বকুনি দিয়ে বললেন, 'দাঁড়া, আজ তোকে এমন মারবো!'

দুষ্টু যেন তখন আর কিছুই জানে না আদুরে গলায় ডাকতে লাগলো, 'কুঁই, কুঁই'।

সেদিন থেকে দুষ্টুর জন্য কেনা হলো বাক্‌লস আর চেন। মাঝে মাঝে তাকে বেঁধে রাখা হয়, কিন্তু বাঁধা থাকাটা সে পছন্দ করে না, চ্যাচায় অনবরত। সেই চ্যাচানি শুনে পুপ্‌লুর বাবা বিরক্ত হন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে খুলে দেন দুষ্টুকে।

সাড়ে পাঁচমাস বয়েসের সময় দুষ্টু হঠাৎ বড় হয়ে উঠলো। এখন তার সামনে কোনো খাবার দেখালে সে ভাল্লুকের মতন দু' পায়ে উঁচু হয়ে দাঁড়ায়। যখন তখন সিগারেটের প্যাকেট আর কাগজ মুখে নিয়ে পালায়। অনেক কথা বোঝে। কিন্তু বুঝেও শোনে না অনেক কথা। সবাই বলে, তার দুষ্টু নাম সার্থক।

বাইরের লোক এলেই দুষ্টু খুব জোরে জোরে ডেকে তেড়ে যায়। অনেকে ভয় পায়। পুপ্‌লুর মামাতো বোন টুয়া আর এ বাড়িতে আসতেই চায় না। পুপ্‌লুর বন্ধু রাজেন বলে, 'আগে ভাই তোমার কুকুর বেঁধে রাখো, তারপর তোমার সঙ্গে খেলবো।'

একদিন পুপ্‌লুর ঘাড়ের কাছে দেখা গেল তিনটে লম্বা দাগ। সেখান থেকে কত রক্ত বেরিয়ে জমে আছে।

পুপ্‌লুর মা আঁতকে উঠে বললেন, 'ওমা, পুপ্‌লু, তোর ঘাড়ের কাছে ওরকম ভাবে কাটলো কী করে?'

পুপ্‌লুর বাবা বললেন, 'এ তো মনে হচ্ছে তুষ্টু কামড়েছে!'

পুপ্‌লু বললো, 'না-না, এমনি কেটে গেছে।'

'এমনি এমনি ঘাড়ের কাছে কেটে যায়?'

'হ্যাঁ, ছাদে খেলতে গিয়ে একটা তারের খোঁচা লেগেছিল।'

পুপ্‌লুর বাবা আর মা দু'জনেই বুঝে গেলেন যে, ওটা আসলে তুষ্টুরই কামড়ানোর দাগ। পুপ্‌লু তার নিজের কুকুরের দোষ চাপা দিতে চাইছে।

পুপ্‌লুর ঘাড়ে লাগিয়ে দেওয়া হলো ডেটল। আর খুব বকুনি দেওয়া হলো তুষ্টুকে। বকুনি খেয়েই সে রেফ্রিজারেটারের তলায় লুকিয়ে পড়লো।

এরপর একদিন সে কামড়ে দিল পুপ্‌লুর বাবাকেই। তুষ্টু একটা মাংসের হাড় নিয়ে এসেছিল পড়বার ঘরে, পুপ্‌লুর বাবা সেটি সরিয়ে নিতে যেতেই তুষ্টু ঘ্যাক করে কামড়ে দিল তাঁর পায়ে। রক্ত বেরোয় নি অবশ্য, কিন্তু পুপ্‌লুর বাবা রেগে গিয়ে একটা খবরের কাগজ পাকিয়ে খুব করে মারলেন তাকে। পুপ্‌লু ছুটে এসে বললো, 'বাবা, ওকে আর মেরো না। ও তো ছোট, তাই বোঝে না।'

এবার সে কামড়ালো পুপ্‌লুর মাকে। তিনি ওকে চান করিয়ে দিচ্ছিলেন। সাদা সাদা লোমগুলো ময়লা হয়ে গেছে। সাবান মাখিয়ে দিলে চকচকে ঝকঝকে হয়ে যায়। সেই সাবান মাখাতে যেতেই সে খুব জোরে কামড়ে দিল পুপ্‌লুর মাকে। রক্ত বেরিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

সেদিন বিকেলবেলা তুষ্টু যেই পুপ্‌লুর মায়ের সঙ্গে খেলা করতে এসেছে, অমনি তিনি রাগ করে বললেন, 'যা, তুই এখান থেকে। তোর সঙ্গে আর কথা বলবো না।'

তুষ্টু অমনি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে নানারকম খেলা দেখাতে লাগলো। সে এমন মজার ভঙ্গি করতে লাগলো যে দেখলে না হেসে পারা যায় না। পুপ্‌লুর মা বারবার বলতে লাগলেন, 'যা, বেরিয়ে

যা এ ঘর থেকে।' সে কিছুতেই যাবে না।

পরদিনই সে কামড়ে দিল ডিমওয়ালাকে।

তার পরদিন নিচের তলার একটা বাচ্চা মেয়েকে।

তার-ও পরের দিন পিওনকে।

ছুট্টুকে নিয়ে আর পারা যায় না। সে যখন তখন যাকে-তাকে তাড়া করে যায়, কিংবা কামড়ায়। যদিও তাকে সব রকম ইঞ্জেকশন দেওয়া আছে, কারুর কোনো ক্ষতি হবে না, কিন্তু অনেকেই ভয় পেয়ে যায়। আবার অন্য সময় সে এমন ভালো হয়ে থাকে, এমন সব মজার মজার খেলা করে যে তখন তাকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে খুব। কামড়ে দেওয়াটাও যেন তার খেলা। বিশেষত বাড়িতে কোনো বাচ্চা ছেলেমেয়ে এলে সে কামড়াতে যাবেই। পুপ্‌লুর বন্ধুদেরও সে তেড়ে যায়। সে চায়, পুপ্‌লু শুধু তার সঙ্গেই খেলা করবে, আর কারুর সঙ্গে নয়।

এরপর একদিন সে পাশের ফ্ল্যাটের দিদিমাকে কামড়ে দিতেই সবাই চটে গেল খুব। পুপ্‌লুর মা কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কেউ এই কুকুরটা নেবে?'

অনেকেই রাজি। একজন তো বললো, 'এমন সুন্দর কুকুরটা দিয়ে দেবেন? আমি এক্ষুনি নিতে রাজি আছি।'

পুপ্‌লুর মা বললেন, 'নিয়ে যাও।'

কিন্তু পুপ্‌লু তখন বাড়িতে! সে এসে এমন চ্যাঁচামেচি করে কান্নাকাটি জুড়ে দিল যে আর দেওয়া গেল না।

পরদিন সে আবার পুপ্‌লুর মাকে কামড়ালো।

আর এ কুকুর রাখা যায় না। সেদিন সকালে পুপ্‌লু স্কুলে গেছে, সে সময় একজন চেনা লোক এলো। পুপ্‌লুর মা জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি এই কুকুরটা নেবে?' সে তক্ষুনি রাজি। এত ভালো জাতের কুকুর কিনতে গেলে অনেক পয়সা লাগে। বিনা পয়সায় পেয়ে সে খুব খুশি।

সত্যিই সে তুষ্টুকে নিয়ে চলে গেল।

পুপ্‌লুর স্কুল থেকে ফেরার সময় হলেই তুষ্টু বসে থাকতো দরজার সামনে। পুপ্‌লু এলেই লাফিয়ে পড়ত তার গায়ে। তখন থেকেই শুরু হতো খেলা। সেদিন তুষ্টুকে না দেখে পুপ্‌লু বললো, 'মা, তুষ্টু কোথায় ?'

মা বললেন, 'সে চলে গেছে। হারিয়ে গেছে।'

পুপ্‌লু বললো, 'না, হারিয়ে যায়নি। তোমরা নিশ্চয় কাউকে দিয়ে দিয়েছো। কেন দিয়েছো ?'

মা বললেন, 'ছ্যাখ, আজ আমার হাতে আবার কতটা কামড়ে দিয়েছে।'

পুপ্‌লু তবু মানলো না, সেদিন খেল না, খেলতে গেল না। কাঁদতে কাঁদতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লো।

পুপ্‌লুর মায়েরও মনটা খারাপ হয়ে গেছে বেশ। এতদিন ধরে পুষলে মায়া পড়ে যায়। কত কথা মনে পড়ছে।

রাত্তির বেলা অফিস থেকে ফিরে পুপ্‌লুর বাবা বললেন, 'তুষ্টু কোথায় ?' তারপর নিজেই আবার বললেন, 'ও, তাকে তো দিয়ে দেওয়া হয়েছে। বড় খালি খালি লাগছে বাড়িটা।'

মা বললেন, 'পুপ্‌লুর খুব মন খারাপ হয়ে গেছে। কিছু খেলনা।'

বাবা বললেন, 'আমারও তো মনটা খারাপ লাগছে।'

মা বললেন, 'ফিরিয়ে আনবো নাকি ? যে নিয়ে গেছে, সে যোধপুর পার্কের কাছে থাকে। বাড়িটা চিনি না।'

বাবা বললেন, 'থাক, আর ফিরিয়ে আনবার দরকার নেই।'

সেদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করে সবাই শুয়ে পড়েছে, এমন সময় খট্‌খট্ করে দরজায় একটা শব্দ। এত রাত্রে কে এলো ? দরজা খুলতেই তুষ্টু এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো বাবার ওপর। ডাকতে লাগলো কুঁই কুঁই করে।

পুপ্‌লু পর্যন্ত ঘুম থেকে উঠে এসেছে। সবাই অবাক। সঙ্গে

আর কেউ নেই। অতদূর যোধপুর পার্ক থেকে তুষ্টু কী করে চলে এলো রাস্তা চিনে!

মা বললেন, 'তুষ্টু, তুই আবার এসেছিস?'

তুষ্টু মায়ের ওপর গিয়ে লুটোপুটি খেতে লাগলো। যেন সে ক্ষমা চাইছে। পুপ্‌লু তাড়াতাড়ি তাকে কোলে তুলে নিয়ে ছুটে চলে গেল নিজের ঘরে।

আশ্চর্য, তারপর থেকে আর একদিনও তুষ্টু কাউকে কখনো কামড়ায় নি।

●

সুশীল মোটেই সুবোধ বালক নয়

সাহেব হুকুম দিলেন, সুশীলকে চাবুক মারা হবে। সুশীলের বয়েস তখন পনেরো, তাই পনেরো ঘা কড়া চাবুক। জেলখানার চত্বরে যমদূতের মতন চেহারার প্রহরী লক্‌লকে চাবুক নিয়ে মারতে লাগলো শপাং শপাং করে। পাশে দাঁড়িয়ে একজন গুনছে এক, দুই, তিন···

পনেরো বছরের ছেলে সুশীল সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কোনো দয়া চাইলো না, কাঁদলো না। সে যে ব্যথা পাচ্ছে তাই বোঝা গেল না। তার ঠোঁটে অল্প হাসি। সে গুন্‌গুন্ করে গান গাইছে, 'আমায় বেত মেরে তুই মা ভোলাবি, আমি কী মার সেই ছেলে?'

মনে হয় রূপকথার গল্প। তা কিন্তু নয়। এখনো তেমন অনেক লোক বেঁচে আছে, যারা এইসব দৃশ্য নিজের চোখে দেখেছে। প্রায় সত্তর বছর আগেকার ঘটনা।

তোমরা অনেকেই বোধহয় জানো যে, একসময় ইংরেজরা ছিল আমাদের রাজা। এখন পৃথিবীতে পরাধীন দেশ প্রায় নেই-ই। কিন্তু এক সময় পৃথিবীর কয়েকটা মাত্র দেশের রাজা পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশ শাসন করতো। আমাদের দেশ দখল করেছিল ইংরেজরা। আমাদের ওপর তারা দারুণ অত্যাচার করতো। আর এদেশের সব জিনিসপত্র নিয়ে যেত নিজেদের দেশে।

তারপর আস্তে আস্তে আমাদের দেশের লোকেরাও প্রতিবাদ করতে শুরু করলে, ইংরেজদের তাড়াবার জন্য শুরু হলা লড়াই। কত ভালো ভালো সাহসী ছেলেমেয়েরা যে সেই লড়াইতে প্রাণ দিয়েছে তার ঠিক নেই। তাদের জন্যই আজ আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে। অথচ তাদের অনেকের কথাই আমরা আজ মনে রাখিনি।

সেই রকম একজনের কথাই আজ আমি শোনাচ্ছি! সত্যি হলেও দারুণ রোমাঞ্চকর গল্প। শেষপর্যন্ত পড়লে তবে বুঝতে পারবে।

ছেলেটির নাম সুশীল সেন। ন্যাশনাল কলেজের ছাত্র। সে একদিন শিয়ালদার কাছ দিয়ে পায়ে হেঁটে আসছে, এমন সময় দেখলো, কোর্টের কাছে খুব ভিড়। কী ব্যাপার? সে থমকে দাঁড়ালো।

সেই কোর্টে তখন একটা বিখ্যাত মামলা চলছে। তোমরা নিশ্চয়ই শ্রীঅরবিন্দর ছবি দেখেছো? এই শ্রীঅরবিন্দর নাম ছিল তখন শুধু অরবিন্দ ঘোষ এবং তিনি ছিলেন 'বন্দেমাতরম্' বলে একটি পত্রিকার সম্পাদক। পুলিশ সেই পত্রিকার নামে মামলা এনেছে। সাক্ষী হিসেবে এনেছে আর একজন বিখ্যাত নেতা বিপিন পালকে। বিপিন পাল আদালতে এসে বেঁকে বসলেন। তিনি নিজে দেশের লোকের বিরুদ্ধে কিছুতেই সাক্ষ্য দেবেন না। তাই নিয়ে হুলুস্থূল কাণ্ড! সেই মামলা দেখার জন্যই ভিড় করেছে অনেক লোক।

পুলিশ তখন ভিড় সরাবার জন্য লাঠি দিয়ে লোকজনকে মারতে শুরু করেছে। তখনকার ইংরেজ পুলিশ আমাদের দেশের লোকেদের তো মানুষ বলেই গণ্য করতো না। দুমদাম করে যখন খুশি পেটাতো। সার্জেন্ট যেই সুশীলকে এক ঘা মেরেছে, সেও উল্টে মেরেছে তার মুখে এক ঘুসি। সে মোটেই সহ্য করার ছেলে নয়, গায়েও খুব জোর। ঘুসি খেয়ে হকচকিয়ে গেল সার্জেন্ট। বাঙালীরা তো কখনো সাহেবের গায়ে হাত তোলবার সাহস দেখায় না। সে তখন লাঠি দিয়ে আবার খুব জোরে মারলো সুশীলকে। সুশীলও আবার তেড়ে এসে এক ঘুসি চালালো। তখন অনেকগুলো পুলিশ এসে সুশীলকে ঘিরে ধরে ফেললো। নিয়ে এলো সাহেব হাকিমের কাছে। হাকিম তো বাঙালীর ছেলের এই আস্পর্ধার কথা শুনেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। হুকুম দিলেন, মারো একে পনেরো ঘা চাবুক।

হাসিমুখে সহ্য করলো সুশীল সেই নির্যাতন। সাহেবরা দেখুক বাংলার ছেলেরা আর সাহেবদের ভয় পায় না।



সুশীলকে নিয়ে দেশের লোকের খুব গর্ব হলো। তাকে নিয়ে মিছিল বার করলো অনেকে মিলে। তখনকার দিনে আমাদের দেশের বড় নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটা সোনার মেডেল পাঠিয়ে দিলেন সুশীলের জন্য।

যে-হাকিম সুশীলকে শাস্তি দিয়েছিল তার ওপর কিন্তু সুশীল খুব রেগে রইলো। এরকম অত্যাচারী সাহেবদের শেষ করতেই হবে। সাহেবকে মারার জন্য সে একটা ফন্দি বার করলো। একখানা খুব মোটা বইয়ের মধ্যে একটা বোমা পুরে পাঠিয়ে দিলেন সাহেবের নামে। সাহেব যেই বইটা খুলবে অমনি বোমাটা ফেটে যাবে। কিন্তু সাহেবটির ভাগ্য ভালো, বইটা নিজে খোলবার আগেই একজন আর্দালি খুলে ফেললে।

প্রতিশোধের আগুন তখন সুশীলের মনের মধ্যে জ্বলছে। সে বুঝলো, শুধু একজন সাহেবকে মারলে তো হবে না। সব সাহেবকে তাড়াতে হবে। সেজন্য বড় দল চাই। অনেক অস্ত্রশস্ত্র চাই। তার জন্য সে পুরোপুরি যোগ দিল বিপ্লবীদের দলে। দেশের লোককে তৈরী করা আর বোমা বানানোর কাজ চলতে লাগলো।

কয়েক মাস পরে সে ধরা পড়ে গেল পুলিশের হাতে। একই সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ, বারীন ঘোষ, কানাই, সত্যেন, উল্লাসকর, উপেন ব্যানার্জি প্রভৃতি বিখ্যাত বীরেরাও ধরা পড়লেন। এদের মধ্যে সুশীলই সবচেয়ে ছোট।

বিচারে তার সাত বছর জেল হলো। কিন্তু তাকে জেল খাটতে হলো না অবশ্য। হাইকোর্টে তিন বিচারকের মধ্যে বারবার মতের অমিল হওয়ায়, শেষ পর্যন্ত ছেড়েই দেওয়া হলো তাকে।

এতবড় একটা শাস্তির হাত থেকে কোনোক্রমে ছাড়া পেলে অনেকেই ভাবে, ওরে বাবা, খুব জোর বেঁচে গেছি, আর ওসব কিছু করতে যাব না। সুশীল কিন্তু মোটেই সে রকম সুবোধ বালক ছিল না। যেমন তার সাহস তেমন তার গোঁ।

আবার সে গোপনে দল তৈরী করলো। সাহেব কয়েকজনকে বন্দী করেছে বলেই কি আর সবাই চুপ করে থাকবে? সেই বন্দীদের ছাড়ানো দরকার। নতুন ছেলেদের বিপ্লবী করে তোলা দরকার।

সুশীল দুটো জিনিস ঠিক করলো। এদেশেরই নেতা হয়ে যারা দেশের ক্ষতি করবে কিংবা বিশ্বাসঘাতকতা করবে, তাদের শাস্তি দিতে হবে। আর টাকা যোগাড় করতে হবে। গোপনে দল চালাতে গেলে আরো টাকা দরকার। সে টাকা কোথা থেকে আসবে? যারা অত্যাচারী, যারা কৃপণ, তাদের কাছ থেকে জোর করে টাকা-পয়সা কেড়ে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। তাদের নাম ছিল তখন স্বদেশী ডাকাত।

সুশীল তার দল নিয়ে এ রকম অনেক বিশ্বসাঘাতককে শাস্তি দিল। অনেক জায়গা থেকে স্বদেশীরা ডাকাতি করে টাকা যোগাড় করতে লাগলো। পুলিশ কিন্তু কিছুতেই তাকে ছুঁতে পারেনি। আর সে পুলিশের হাতে ধরা দেবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছে।

একবার কী কাণ্ড হলো শোনো। সুশীল এইসময় নদীতে নৌকোয় করে ঘুরে বেড়ায়। আর সুযোগ পেলে কৃপণ বড়লোকদের কাছ থেকে টাকা কেড়ে নিয়ে এসে গরিবদের দেয়। এরকম ভাবে একদিন তারা নদীয়া জেলার দুটো গ্রাম থেকে দু'বার লুঠ করে নৌকোয় চেপে পালাচ্ছে। অনেকক্ষণ নৌকো চালিয়ে এসে যখন নিশ্চিন্ত হলো যে পুলিশ তাদের খোঁজ পায়নি, তখন দলের লোকেরা বললো, বড্ড খিদে পেয়েছে। খিদে তো পাবেই, দেড় দিন ধরে কিছু খাওয়া হয়নি!

নদীর ধারে নৌকো থামিয়ে তারা রান্না করতে বসলো। গ্রামের কয়েকজন লোক এরকম কয়েকটি অচেনা ছেলেকে দেখে সন্দেহ করলো। নিশ্চয়ই এরা ডাকাত। চুপিচুপি খবর দিল পুলিশকে। একদল পুলিশ এসে পড়লো হুড়মুড় করে। তখনো রান্না শেষ হয়নি। খাওয়া আর হলো না, সুশীলেরা নৌকোয় উঠে পড়লো। পুলিশ

তখন গুলী ছুঁড়তে শুরু করেছে, ওরাও গুলী ছুঁড়ে তার উত্তর দেয়।

অন্ধকার রাত। গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে ডাকাতরা পলিয়ে গেল ঠিকই, কিন্তু এরই মধ্যে দারুণ একটা দুঃখের ঘটনা ঘটে গেল।

দুরন্ত সাহসের সঙ্গে সুশীল আর তার দু'তিনজন বন্ধু গুলী ছুঁড়ছে পুলিশের দিকে। হঠাৎ এক সময় সুশীলের পাশেই যে বন্ধুটি দাঁড়িয়েছিল তার পা পিছলে গেল। সে হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতেই তার হাতের পিস্তলটা ঘুরে গেল উল্টোদিকে। আর তার থেকে গুলী বেরিয়ে সোজা ঢুকে গেল সুশীলেরই পেটে।

সুশীল ধপাস করে পড়ে গেল জলে। দলের লোকেরা তো হতভম্ব। তাড়াতাড়ি তাকে জল থেকে আবার নৌকোয় টেনে তুললো। সুশীলের তখনো জ্ঞান আছে, কিন্তু সে বুঝে গেছে যে সে আর বেশিক্ষণ বাঁচবে না। যে বন্ধুটির হাত ফস্‌কে গুলী লেগেছিলো তার পেটে, তার ওপর সে একটুও রাগ করলো না। বরং কী করে বন্ধুরা পুলিশের হাতে ধরা না পড়ে পালাতে পারবে, সেটাই হলো তার একমাত্র চিন্তা। সে ফিসফিস করে বললো, শোন, আমি জানি, আমি আর বাঁচব না! আমি মরে গেলে তোরা আমার মৃতদেহটা সঙ্গে করে নিয়ে যাস না। তাতে কোন লাভ নেই, শুধু শুধু নৌকোটা ভারি হয়ে থাকবে। নৌকোটা হাল্‌কা রাখা দরকার। সেইজন্য আমার মৃতদেহটা জলে ফেলে দিস। তার আগে শরীর থেকে কেটে ফেলিস মুণ্ডুটা। দুটো আলাদা জায়গায় ফেলবি। আমার শরীরটা ভেসে উঠলেও পুলিশ চিনতে পারবে না……।

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সুশীল মরে গেল। বন্ধুরা কাঁদতে কাঁদতে সুশীলের কথামতই কাজ করলো। তখনো দূরে পুলিশ তেড়ে আসছে। বন্ধুরা নদীর এক জায়গায় একটা বাঁশ পুঁতে তার ডগায় বেঁধে দিল ওর রুমালটা। ঐটুকুই সুশীলের স্মৃতিচিহ্ন।

এই ঘটনা ঘটেছিল আজ থেকে ঠিক সাতষট্টি বছর আগে। ১৯১৫ সালের মে মাসে। তখন সুশীল সেনের বয়স মাত্র তেইশ।

যে-ইংরেজ হাকিম সুশীলকে প্রথম বেত মারার শাস্তি দিয়েছিল তার নাম কিংসফোর্ড। এই কিংসফোর্ড সাহেবকে মারবার জন্যই মজঃফরপুর পর্যন্ত তাড়া করে গিয়েছিল ক্ষুদিরাম। তোমরা নিশ্চয়ই শহিদ ক্ষুদিরামের কথা সবাই জানো। নাকি জানো না? তাহলে আমি মনে খুব দুঃখ পাবো। না জানলে এক্ষুনি বাবা-কাকার কাছে জিজ্ঞেস করে নাও।

বারুইপুরের সিংহ-সম্রাট

মনে করো, তুমি বাসে চড়ে বেড়াতে যাচ্ছো কলকাতা থেকে বারুইপুরে। বেশি তো দূর নয়। মাত্র পনেরো-কুড়ি মাইল। নরেন্দ্রপুরের রামকৃষ্ণ মিশন স্কুল ছাড়িয়ে বাস চলেছে সোজা। এ দিককার রাস্তা ফাঁকা।

হঠাৎ যদি মাঝ-রাস্তায় দেখতে পাও একটা প্রকাণ্ড সিংহ বসে আছে—মাটির সিংহ নয়, জলজ্যান্ত সিংহ।

ভাবছো এটা গাঁজাখুরি কথা? বারুইপুরের রাস্তায় সিংহ আসবে কী করে? আমাদের পশ্চিম বাংলায় কি সিংহ আছে নাকি? সুন্দরবন থেকে একটা রয়াল বেঙ্গল টাইগার ছিটকে চলে এলেও আসতে পারে। কিন্তু সিংহ, সে তো অসম্ভব!

আমি যদি বলি মোটেই অসম্ভব নয়, সত্যিই সম্ভব! তুমি তা হলে বলবে, ও বুঝেছি! ওখানে নিশ্চয়ই কোনো সার্কাসের তাঁবু পড়েছিল। সেখান থেকে একটা সিংহ কোনো রকমে বেরিয়ে এসেছে।

না, তাও নয়। এটা মোটেই সার্কাসের রোগা-পটকা বুড়ো সিংহ নয়। রীতিমত তাগড়া জোয়ান সিংহ, মাথাভর্তি কেশর। তাছাড়া আজকাল বেশির ভাগ সার্কাসের দলেই সিংহ থাকে না। সিংহ অত সহজে পাওয়া যায় না।

বারুইপুরে সত্যিই কিন্তু একটা সিংহ আছে। আমি দেখেছি।

আসলে ব্যাপারটা কী? জাদুকর পি. সি. সরকার জুনিয়ারের দু' তিনটে বাড়ি আছে ঐখানটায়, বারুইপুরের কাছেই। পি. সি. সরকার জুনিয়ারের পুরো নাম প্রদীপ চন্দ্র সরকার। উনি জন্তু-জানোয়ার খুব ভালবাসেন।

উনি তো ওঁর ম্যাজিকের দল নিয়ে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ান, নানান দেশের লোক ওঁকে অনেক রকম জিনিস উপহার দেয়। একবার আফ্রিকার এক দেশ থেকে উনি উপহার পেয়েছিলেন একটা সিংহের বাচ্চা!

সিংহের বাচ্চা দেখতেও যেমন সুন্দর হয়, তেমনি ভয় পাবারও কিছুই নেই। সবাই কোলে নিয়ে আদর করে। আদর পেয়ে বাচ্চাটা ঘর-র ঘ-র-র শব্দ করে।

ম্যাজিশিয়ান প্রদীপ সরকার তখন সিংহের বাচ্চাটাকে তাঁর কলকাতার বাড়িতেই রাখতেন। নিজের গাড়িতে নিয়ে বেড়াতে যেতেন।

কিন্তু সব বাচ্চাই তো একদিন বড় হয়। বাচ্চা সিংহটাও আস্তে আস্তে আসল সিংহ হয়ে উঠতে লাগলো।

এবারে তাকে দেখলেই কেমন গা ছমছম করে। চোখদুটো কী রকম রাগী রাগী। তার ডাক শুনলে মনে হয় মেঘের আওয়াজ। এরকম সিংহকে তো আর কলকাতায় রাখা যায় না। পাড়ার লোক তার গর্জন শুনে আঁতকে ওঠে।

সিংহটার নাম দেওয়া হয়েছে 'সম্রাট'। তার মেজাজও ঠিক সম্রাটের মতন।

এবারে সিংহটাকে নিয়ে রাখা হলো বারুইপুরের বাগান বাড়িতে। সেখানে ম্যাজিশিয়ান সাহেবের আরও অনেক জন্তু আছে। আছে একটা হাতি, একটা উট। এদের কিন্তু এক জায়গায় রাখা হয় নি। এদের জন্য আলাদা আলাদা বাড়ি।

একটা কংক্রিটের হলঘর বানিয়ে সেখানে রাখা হয়েছে সম্রাটকে। শক্ত মোটা শিকল দিয়ে তার দু'পা বাঁধা। সামনে লোহার গেট। সেই গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে লোকেরা সিংহটাকে দেখতে আসে। সম্রাট মাঝে মাঝে উঠে দাঁড়ায়। ল্যাজটা আছড়ায়, কিন্তু কখনো কারুকে তেড়ে আসে না। সবাই বলে

সম্রাট খুব শান্ত।

প্রত্যেকদিন দশ-বারো কেজি করে মাংস দেওয়া হয় সম্রাটকে। এক একদিন সম্রাটের ঐ মাংসে অরুচি হয়, সে খেতে চায় না। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ করে শুয়ে থাকে। তার কী যে হয়েছে তা ঐ বাড়ির কেয়ার-টেকাররা বুঝতে পারে না।

তবে ম্যাজিশিয়ান সাহেব এলে সিংহটা তাকে চিনতে পারে। গেটের কাছে চলে এসে নাকটা বাড়িয়ে দেয়। ম্যাজিশিয়ান সাহেব মাংস ছুঁড়ে দিলে সম্রাট টপ করে লুফে নেয়।

একদিন ঐ বাড়িতে একটা চোর এসেছিল। চোরটা অন্য গ্রামের লোক। সে সিংহের কথা জানতো না। সে তো রাত্তিরের অন্ধকারে চুপি চুপি ঢুকেছে। লোহার গেট পেরিয়ে এসে আগে বুঝে নিচ্ছে কোন্ দিক দিয়ে ঢোকা যায়।

চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার!

প্রথম গেটের পরেই ডানদিকে আবার একটা লোহার গেট দেখে চোর ভাবলো, এর মধ্যে কী আছে একটু দেখা যাক তো!

যেই সে সেই গেটটায় মুখটা চেপে ধরেছে অমনি প্রচণ্ড হুংকার করে সম্রাট ঝাঁপিয়ে পড়লো সেখানে।

চোরটা ঠিক বুঝতেই পারলো না কী ব্যাপার হলো। সে সিংহের ডাকই শোনে নি আগে কখনো। সে ভাবলো বুঝি তার মাথায় বাজ পড়েছে!

বিরাট চিৎকার করে উঠলো সে, ওরে বাবারে, মরে গেলুম রে। তার পরেই সে অজ্ঞান।

সেই আওয়াজে বাড়ির লোকজন জেগে উঠে ছুটে এলো, আলো জ্বাললো। তারা দেখলো, একটা লোক মাটিতে পড়ে ছটফট করছে আর চ্যাচাচ্ছে, ওরে বাপরে, আমি মরে গেছি। আমি মরে গেছি! আমার এ কী হলো!

একজন তার হাত ধরে তুলতে যেতেই সে আরও ভয় পেয়ে



বললো, ওগো, তোমরা কে? যমদূত? আমি তো মরে গেছি।

শেষে এমন অবস্থা হলো যে সেই চোরের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার ডাকতে হলো।

এই রকম ভাবে তো কেটে গেল আরও দুটো বছর। তারপর একদিন হলো সেই কাণ্ডটা।

সম্রাট যে ক্রমশ রাগী হয়ে উঠছে তা কেউ লক্ষ্য করে নি। ঐ দশ-বারো কিলো মাংসতে তার আর পেট ভরে না। রোজ রোজ একরকম মাংস তার ভালোও লাগে না। বনের সিংহ কত রকম শিকার ধরে খায়।

আমরাও কি রোজ এক খাবার ভালোবাসি?

একদিন হয়েছে কি, গ্রামের এক বাড়ির একটা ছাগলছানা ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছে সেখানে! ছাগলের তো বুদ্ধি, সে আবার গিয়ে দাঁড়িয়েছে সেই সিংহের লোহার গেটের সামনে। অবশ্য ছাগলছানা তো কোনোদিন সিংহ দেখে নি। সে ভাবছে, এটা আবার কে?

ছাগলছানার বয়েস একবছরও হয় নি, তা হলেও না হয় সে দুর্গা পূজোর সময় মা দুর্গার মূর্তির পায়ের কাছে সিংহটাকে দেখে চিনে রাখতে পারতো। সে যে একেবারে কচি, তাই সরল মুখ করে ম্যা-অ্যা-অ্যা করে ডাকতে লাগলো।

ছাগলছানাটাকে দেখেই চকচক করে উঠেছে সম্রাটের চোখ। জেগে উঠেছে তার শিকার করার ইচ্ছে। দুই ঝাপটে সে ছিঁড়ে ফেললো দু' পায়ের শিকল, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়লো লোহার গেটের ওপর।

তালাটা বোধহয় পুরোনো হয়ে গিয়েছিল, সম্রাটের ধাক্কা খেয়ে সেটা মট করে খুলে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল লোহার গেট।

ছাগলছানা বুঝেছে, ব্যাপারটা সুবিধের নয়। সে অমনি

দিয়েছে পোঁ-পাঁ করে ছুট। সিংহ মারলো এক লাফ।

এখন মুস্কিল হয়েছে কী, অতবড় সিংহ তো ছোট লাফ দিতে জানে না। সে বিরাট এক লাফ মারছে আর ছাগলছানাটাকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে গিয়ে পড়ছে। ছাগলছানাটা আবার উলটো দিকে ফিরে দৌড়োচ্ছে।

সিংহ বাইরে বেরিয়ে এসেছে দেখেই গ্রামের লোক ভয় পেয়ে বাড়ি ছেড়ে যে-যেদিকে পারলো ছুটলো। সিংহকে যে কী করে আটকাতে হয় তা তো তারা জানে না।

সিংহটা কয়েকটা লাফ দিয়েও ছাগলছানাটাকে ধরতে না পেরে মহা রেগে গেল। ছাগলছানাটা এর মধ্যে কোথায় পালিয়েছে। সিংহ তখন গর্জন করতে করতে চলে এলো বড় রাস্তায়। সেখানে গ্যাঁট হয়ে বসে রইলো।

বাড়ি থেকে সিংহটা অনেক দূরে চলে গেছে খবর পেয়ে কেয়ার-টেকার চুপি চুপি ফিরে এলো বাড়িতে। তারপর ম্যাজিশিয়ান সাহেবকে ফোন করে বললো, সার, সার, শিগ্‌গীর চলে আস্থন!

ম্যাজিশিয়ান সাহেব বললেন, কী ব্যাপার? আজ তো যেতে পারবো না। আজ যে আমার রাজভবনে শো আছে!

কেয়ার-টেকার বললো, সার, এক মিনিটও দেরি করবেন না। আমি আর কতক্ষণ বাঁচবো বলতে পারছি না। সম্রাট ছাড়া পেয়েছে, আর এখানকার অনেক মানুষকে খেয়ে ফেলেছে!

ম্যাজিশিয়ান সাহেব ভাবলেন, তা হলে তো যেতেই হয়।

আমি তখন বসেছিলুম ম্যাজিশিয়ান সাহেবের ঘরে। আমায় উনি বললেন, যাবেন নাকি আমার সঙ্গে?

আমি আমতা আমতা করে বললুম, তা যেতে পারি, আমি ভয় পাচ্ছি না। কিন্তু সিংহ ধরা তো ম্যাজিশিয়ানদের কাজ নয়। সার্কাসের লোকদের খবর দিলে হয় না?

ম্যাজিশিয়ান সাহেব বললেন, সার্কাসের লোক এখন পাবো

কোথায়? আমাকেই যেতে হবে। সম্রাট আমার পোষা। ও বোধহয় আমায় কিছু বলবে না।

ব্যাপারটা কী দাঁড়ায় তা দেখবার জন্য আমি প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে গেলুম ওঁর সঙ্গে। দুর্দান্ত স্পীডে গাড়ি চালিয়ে আমরা পৌঁছে গেলুম আধঘণ্টার মধ্যে। আসতেই রাস্তায় দেখলুম, হাজার হাজার লোক দৌড়ে পালাচ্ছে, আর চিৎকার করছে, সিংহ! সিংহ!

আমরা খানিক দূরে গাড়ি থামালুম। কালো পীচের রাস্তার ঠিক মাঝখানে বসে আছে সম্রাট। আমাদের গাড়িটা থামতে দেখেই সে একটা হুংকার দিল।

আমি ম্যাজিশিয়ান সাহেবের হাতটা চেপে ধরে বললুম, শুনুন, ও যদি ক্ষেপে গিয়ে থাকে? যদি আগেই আক্রমণ করে? ঝুঁকি নেওয়াটা কি ঠিক হবে?

ম্যাজিশিয়ান সাহেব বললেন, দেখুন না ব্যাপারটা কী দাঁড়ায়!

গাড়ি থেকে নেমে এক-পা এক-পা করে তিনি এগোতে লাগলেন। হাতে শুধু তার ছোট ম্যাজিক-দণ্ডটা। তিনি ডাকতে লাগলেন, সম্রাট! সম্রাট! কাম হিয়ার! বী এ নাইস বয়।

সিংহটা কিন্তু ওর ডাকে কোনো সাড়া দিল না। লেজ আছড়াতে আছড়াতে গর-গর শব্দ করতে লাগলো। চোখদুটো সাংঘাতিক হিংস্র দেখাচ্ছে। ম্যাজিশিয়ান সাহেব কিন্তু ভয় না পেয়ে এগিয়েই যেতে লাগলেন। আমার তো ভয়ে দম বন্ধ হয়ে আসছে। এই বুঝি সব গেল।

সিংহটা উঠে দাঁড়িয়েছে। ঘাড় নিচু করেছে, ঠিক লাফাবার ভঙ্গি। আমি চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলুম, তার আগেই আর একখানা সাংঘাতিক ব্যাপার হলো। ম্যাজিশিয়ান সাহেব জাদুদণ্ডটা উঁচু করে কী একটা কথা বলতেই ব্যস! সিংহ অদৃশ্য। সেখানে রয়েছে ছোট্ট একটা হলদে রঙের বেড়ালের বাচ্চা!

ম্যাজিশিয়ান সাহেব সেই বেড়াল বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিয়ে

এগিয়ে গেলেন নিজের বাড়ির দিকে। তারপর লোহার গেট খুলে দিয়ে বললেন, তুষ্টু, আয় তোর পায়ে শিকল পরিয়ে দিই!

তোমরা যদি ইচ্ছে করো, যে-কোনোদিন বারুইপুরে গিয়ে দেখে আসতে পারো। সেই পুষি বেড়ালটা আবার একটা প্রকাণ্ড সিংহ হয়ে গেছে। এখন সে খুব শান্ত।

●

রাক্ষুসে পাথর

বুড়ো মাঝি বললো, বাবু বেড়াতে এসেছেন, বেড়িয়ে ফিরে যান। ঐ দ্বীপে যাবেন না, ওখানে দোষ লেগেছে।

আমরা একটু অবাক হলাম। দোষ লেগেছে মানে কী? দ্বীপের আবার দোষ লাগে কী করে?

বিমান বললো, বুড়ো কর্তা, তুমি যা টাকা চেয়েছো, তাই দিতে আমরা রাজি হয়েছি। তবু তুমি আমাদের নিয়ে যাচ্ছো না কেন? ঐ দ্বীপে কি আছে?

বুড়ো মাঝি তার সাদা দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে বললো, কিছুই নেই, সেই কথাই তো বলছি। শুধুশুধু ওখানে গিয়ে কী করবেন?

বুড়ো মাঝি হাল ধরেছে, আর দাঁড় বাইছে তার নাতি। এই নাতির বয়েস তো চোদ্দ বছর হবে। ওর নাম সুলতান, সে কেমন যেন ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে।

বুড়ো মাঝি যতই 'না' বলছে, ততই আমাদের জেদ চেপে যাচ্ছে। একটা সাধারণ দ্বীপ, সেখানে কি এমন ভয়ের ব্যাপার থাকতে পারে? কত জাহাজ যাচ্ছে এখান দিয়ে, সে রকম কিছু থাকলে সবাই জানতে পারতো।

হলদিয়াতে বিমানের দাদা চাকরি করে। আমি আর বিমান কয়েক দিনের জন্য এসেছি এখানে বেড়াতে। হলদিয়া জায়গাটা বেশ সুন্দর। নতুন বন্দর, নতুন শহর গড়ে উঠেছে। চারদিকে সবই নতুন নতুন বাড়ি আর অনেক ফাঁকা জায়গা। শহরটার একদিকে গঙ্গা আর একদিকে হলদি নদী।

সকালবেলা নদীর ধারে জেলেরা মাছ বিক্রী করতে আসে। আমরা সেই মাছ কিনতে গিয়েছিলুম। ঘাটে অনেকগুলো নৌকো

বাঁধা। নৌকো দেখেই আমাদের মনে হলো, একটা নৌকো ভাড়া করে নদীতে বেড়িয়ে এলে কেমন হয়। একজন মাঝিকে জিজ্ঞেস করতেই সে রাজি হয়ে গেল। তিরিশ টাকা দিলে সে যতক্ষণ ইচ্ছে আমাদের ঘুরিয়ে আনবে।

আমি আর বিমান ছ'জনেই সাঁতার জানি, সুতরাং আমাদের জলের ভয় নেই। বিমান তো সুইমিং কমপিটিশনে অনেকবার প্রাইজ পেয়েছে।

আমি আগেই শুনেছিলাম যে হলদিয়ার কাছে একটা দ্বীপ আছে, তার নাম আগুনমারির চর। আগে সেই চরটা মাঝে মাঝে ডুবে যেত আবার মাঝে মাঝে জেগে উঠতো। এখন আর ডোবে না। এখন সেখানে গাছপালা জন্মে গেছে। কোনো মানুষজন অবশ্য সেখানে এখনো থাকে না।

নৌকো দেখেই আমার ঐ দ্বীপটার কথা মনে এসেছিল। নতুন দ্বীপ মানেই তো নতুন দেশ। ওখান থেকে ঘুরে এলেই একটা নতুন দেশ দেখা হয়ে যাবে। অনেকদিন বাদে, যখন ঐ দ্বীপেও অনেক ঘর-বাড়ি হয়ে যাবে, কলকারখানা বসবে, তখন আমরা বলবো, জানো, যখন আমরা আগুনমারিতে গিয়েছিলুম, তখন এসব কিছু ছিল না, শুধু গাছপালা আর···

গাছপালা ছাড়া আর কী আছে সেই দ্বীপে? বুড়ো মাঝি ভয় পাচ্ছে কেন?

নৌকোয় চড়বার সময় মাঝিদের কক্ষনো চটাতে নেই। সেইজন্য আমি অনুনয় করে বললুম, ও বুড়ো কর্তা, বলো না সেখানে কী আছে? কেন আমাদের যেতে বারণ করছো?

বুড়ো মাঝি বললো, কিছু নেই তো বলছি গো বাবু। শুধু কয়েকটা গাছ আর বালি, আর ঐ শামুক ঝিনুক ভাঙা।

বিমান বললো, তাহলে আমাদের সেখানে নিয়ে যেতে চাইছো না কেন? সেখানে কি ভয়ের কিছু আছে?

বুড়ো মাঝি বললো, আকাশে মেঘ দেখো না বাবু। এখন আর অতদূরে যাওয়া ঠিক নয়। এই কিনারায় কিনারায় থাকা ভালো!

বিমান বললো, তুমি কি আমাদের ছেলেমানুষ পেয়েছো? সামান্য মেঘ, এতে কখনো ঝড় ওঠে? তুমি আমাদের নিয়ে যেতে চাও না তাই বলো।

আমি বুড়ো মাঝির নাতিকে জিজ্ঞেস করলুম, সুলেমান, তুমি গেছো সেই দ্বীপে? সেখানে ভয়ের কিছু আছে?

সুলেমান তার দাদুর দিকে তাকালো একবার। তারপর বললো, কিছু নাইকো। অন্য কিছু দেখাও যায় না। তবে সেখানে গেলে যেন মনটা কেমন কেমন করে। মনটা খারাপ হয়ে যায়।

এ তো আরও অদ্ভুত কথা, একটা দ্বীপে গেলে মন খারাপ হয়ে যায়! আমি আর বিমান দু'জনেই হেসে উঠলুম। তা হলে তো যেতেই হবে সেখানে।

বুড়ো মাঝিকে বললুম, তুমি যদি না নিয়ে যেতে চাও তো আমাদের ফেরত নিয়ে চলো। আমরা অন্য নৌকো ভাড়া করবো।

বুড়ো মাঝি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, আপনাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছি, সে টাকা ফেরত দেওয়া পাপ। তবে চলেন নিয়ে যাই। পরে যেন আমাকে দোষ দেবেন না। ওরে সুলেমান, ভালো করে টান।

আকাশে মেঘ আছে বটে কিন্তু জমাট কালো নয়। সেই মেঘের ছায়া পড়েছে জলে। রোদ নেই, বেশ ছায়া-ছায়া ছিল। নদীতে বড় বড় ঢেউ। এখানে নদী প্রায় সমুদ্রের মতন। এপার ওপার দেখাই যায় না। পাশ দিয়ে জাহাজ কিংবা স্টিমার গেলে আমাদের নৌকোটা দুলে দুলে উঠছে।

খানিকক্ষণ পরে বুড়ো মাঝি ডানদিকে হাত তুলে বললো, ঐ যে দ্যাখেন, আগুনমারির চড়া। দেখলেন তো?

আমি আর বিমান দু'জনেই ঘাড় ফেরালুম। মনে হলো নদীর

বুকেই যেন কয়েকটা গাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। মাটি দেখা যাচ্ছে না।

বুড়ো মাঝি বললে, দেখা হলো তো? এবারে নৌকো ঘোরাই?

আমি আর বিমান একসঙ্গে বলে উঠলুম, সে কি, আমরা কাছে যাবো না!

—কাছে গিয়ে আর কী করবেন? আর তো দেখার কিছু নাই!

বিমান এবারে বেশ রেগে গিয়ে বললো, তোমার মতলব কি বলো তো, বুড়ো কর্তা? ঐ দ্বীপে কি তোমার কোনো জিনিসপত্তর আছে? ওখানে আমাদের যেতে দিতে চাও না কেন?

বুড়ো মাঝি আমতা আমতা করে বললো, দেখা তো হলোই, আরোও কাছে গিয়ে লাভটা কী?

বিমান বললে, লাভ-লোকসানের কথা নয়। আমরা ঐ দ্বীপে নেমে হাঁটতে চাই।

বুড়ো মাঝি এবারে খুব জোরে হাল ঘোরাতেই নৌকোটা তরতরিয়ে এগিয়ে গেল। দ্বীপটার একেবারে কাছে পৌঁছে নৌকোটার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বুড়ো মাঝি বললো, এবারে নামুন।

সেখানটায় অন্তত এক হাঁটু জল, তারপর কাদামাটি। বিমান বললো, আর একটু এগোও, এখানে নামবো কি করে?

বুড়ো মাঝিও এবার রাগে গড়গড়িয়ে বললে, আপনাদের বাবু এখানেই নামতে হবে। আমার নৌকো ঐ চরের মাটি ছোঁবে না। ও মাটি অপয়া।

বিমান আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, আমি বললুম, ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমরা এখানেই নামবো।

জুতো খুলে রাখলুম নৌকোয়। তারপর হাঁটু পর্যন্ত প্যাণ্ট গুটিয়ে নেমে পড়লুম জলে। ছপ-ছপ করে এগিয়ে গেলুম দ্বীপটার দিকে। বুড়ো মাঝি নৌকোটাকে আরো গভীর জলের দিকে নিয়ে গিয়ে ঝপাং করে নোঙর ফেলে দিল।

দ্বীপটাতে ছাড়া-ছাড়া গাছপালা রয়েছে। তারপর ধূ-ধূ করছে বালি। সেই বালিতে কোথাও কোথাও ঘাস হয়েছে। একটা খড়ের চালাঘরও রয়েছে এক পাশে। সেই ঘরে কিন্তু কোনো মানুষ নেই।

কাদামাখা পায়ে ওপরে উঠে আমরা বালিতে পা ঘষে নিলুম। বিমান বললো, একটা কিছু ফ্ল্যাগ সঙ্গে নিয়ে এলে হতো। তা হলে সেই ফ্ল্যাগটা পুঁতে আমরা এই দ্বীপটা দখল করে নিতুম!

আমি বললুম, তা কী করে হবে? আগেই তো এখানে মানুষ এসেছে। দেখছিস না, ঘর রয়েছে?

আমরা ঘরটার কাছে গিয়ে দেখলুম, তার মধ্যে পাতা আছে একটা খাটিয়া। আর চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে শুকনো গোবর। জায়গাটায় বিচ্ছিরি গন্ধ।

বিমান বললো, এখানে লোকেরা গরু চড়াতে আসতো, কিন্তু গরুগুলোকে নিয়ে আসতো কী করে?

আমি বললুম, বড় বড় নৌকোয় করে নিয়ে আসতো। আমি নৌকোয় গরু-মোষ পার করতে দেখেছি।

—তারা এখন আর আসে না কেন?

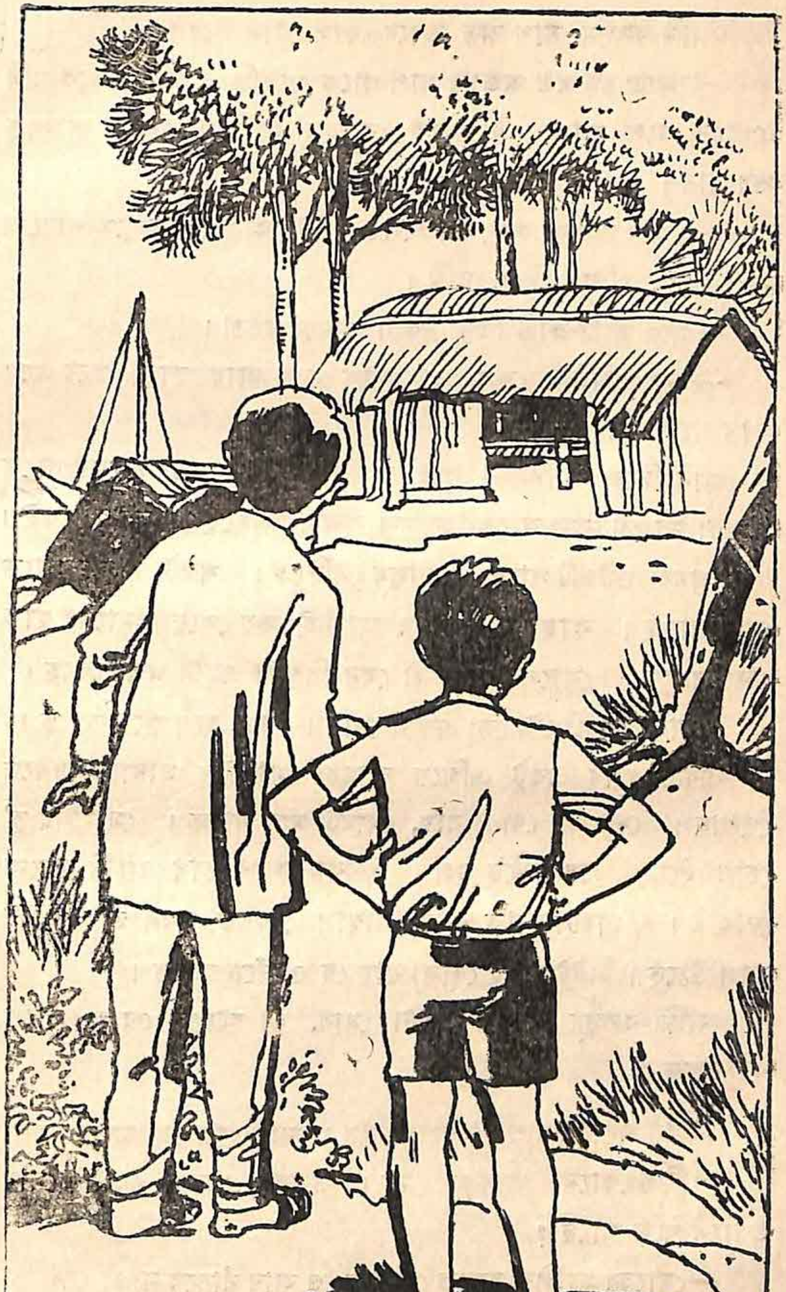
—বর্ষাকাল এসে গেছে, সেইজন্য এখন আসে না। এ তো সোজা কথা।

—দ্বীপটা কী রকম চুপচাপ লক্ষ্য করছিস? কোনো শব্দ নেই।

—মানুষজন নেই, শব্দ হবে কী করে? তবু, আমি কিন্তু একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কান পেতে শোন।

দু'জনেই চুপ করে দাঁড়ালুম। সত্যি খানিকটা দূরে গাছপালার আড়াল থেকে মাঝে মাঝে একটা ফোঁস ফোঁস শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কেউ যেন নিঃশ্বাস ফেলছে খুব জোরে। কোনো মানুষ অবশ্য অত জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে পারে না।

বিমানের মুখটা শুকিয়ে গেল। চোখ বড় বড় করে বললো,



ওটা কিসের শব্দ বল তো, সুনীল ? সাপ নাকি ?

আমি বললুম, সাপ অত জোরে ফোঁস ফোঁস করে ?

— সমুদ্রে বড় বড় অজগর সাপ থাকে শুনেছি। সমুদ্র থেকে যদি এখানে চলে আসে, ঐ জন্যই বোধহয় মাঝিরা এখানে আসতে ভয় পায়।

—একটা অজগর সাপ থাকলেও সেটাকে মেরে ফেলতে পারতো না ? চল, এগিয়ে গিয়ে দেখি।

—সঙ্গে লাঠি-ফাটি কিছু একটা আনলে হতো।

—ভয় পাচ্ছিস কেন, বড় সাপ তো আর তাড়া করে এসে কামড়াতে পারে না।

ডান দিকে খানিকটা দূরে দু' তিনটে বড় বড় গাছের পাশে কিছুটা জায়গা ঝোপঝাড়ের মতন। শব্দটা আসছে সেদিক থেকেই।

আমরা গুটিগুটি পায়ে এগোলুম সেদিকে। শব্দটা মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছে। কাছাকাছি গিয়ে আমিই ভয় পেয়ে বিমানের হাত চেপে ধরলুম। ঝোপের মধ্যে কী যেন বিশাল একটা জন্তু রয়েছে।

বিমান বললে, ওটা তো একটা মোষ। কাৎ হয়ে শুয়ে আছে।

এবারে আর একটু এগিয়ে আমরা মোষটার মাথাটা দেখতে পেলাম। দেখলেই বোঝা যায়, মোষটা মরে যাচ্ছে। মোষটার দু' চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে জল। ওরকম করুণ চোখ আমি কখনো দেখিনি। মোষটা মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস ফেলছে, তখন তার পেটটা ফুলে উঠছে। ঐটুকুতেই বোঝা যায় যে ও বেঁচে আছে।

আমি বললুম, এতবড় একটা মোষ, কী হয়েছে ওর ? সাপে কামড়েছে ?

বিমান বললো, অসুস্থও হতে পারে। মোষেরাও তো অসুস্থ হয়।

—কিন্তু কোনো লোকজন নেই। একলা একলা একটা মোষ এখানে পড়ে আছে ?

—মোষের মালিক বুঝতে পেরেছে, ও আর বাঁচবে না। সেইজন্য

ওকে ফেলে রেখে চলে গেছে।

আমরা আর ঝোপটার মধ্যে না ঢুকে এদিকে ওদিকে ঘুরতে লাগলুম। যতবার মোষটার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনছি, ততবার মনটা খারাপ লাগছে।

বিমান বললো, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিস, এখানে গাছের পাতাগুলো কেমন যেন শুকনো শুকনো। এখন বর্ষাকালে তো গাছের পাতা শুকিয়ে যায় না।

আমি বললুম, গাছগুলোর ছাল খসে পড়েছে অনেক জায়গায়। এখানে তো জল নোনা, তাই বোধহয় গাছের স্বাস্থ্য ভাল থাকে না।

বিমান বললো, বাজে কথা বকিস না। সুন্দরবনে অত গাছ রয়েছে না? সেখানকার জল তো আরও বেশি নোনা। এখানকার গাছগুলোর বোধহয় কিছু একটা রোগ হয়েছে। ওটা কী রে?

—ওটা তো একটা পাথর।

—আশ্চর্য তো! খুবই আশ্চর্য ব্যাপার!

—কিসের আশ্চর্য?

—তুই বুঝলি না? গঙ্গা নদীর দ্বীপে পাথর আসবে কী করে?

—কেন?

—এখানে কি কোথাও পাথর আছে? এদিকে কি কোথাও পাহাড় আছে? এখানে এতবড় একটা পাথর কে নিয়ে আসবে?

পাথরটা এমনিতেই খুবই সাধারণ। একটা মাঝারি ধরনের আলমারির সাইজের। যে-কোনো পাহাড়ী জায়গায় গেলে এরকম পাথরের চাঁই পড়ে থাকতে দেখা যায়। কিন্তু নদীর ওপরে একটা নতুন দ্বীপে ওরকম পাথর তো দেখতে পাওয়া স্বাভাবিক নয়।

আমরা পাথরটার কাছে গেলুম। সেটার গায়ে শ্যাওলা জমে গেছে। আমি পাথরটার গায়ে হাত দিয়ে বললুম, সমুদ্রের তলায় অনেক জায়গায় ডুবো পাহাড় থাকে। হয়তো গঙ্গার এখানটাতেও ডুবো পাহাড় আছে। দ্বীপটা তৈরি হবার সময় পাথরটা উঠে

এসেছে !

বিমান হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বললো, তোর কী বুদ্ধি ? পাথর কি হাল্‌কা জিনিস যে জলের উপরে ভেসে উঠবে ? তা ছাড়া ছাখ, এর তলায় কিছু ঘাস চাপা পড়ে আছে। এই দ্বীপটা হবার পর কেউ পাথরটা এখানে এনেছে। কিন্তু শুধু শুধু এতবড় একটা পাথরকে এখানে বয়ে আনবে কেন ?

আমি পাথরটার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললুম, উল্কা নয় তো ! অনেক সময় উল্কার টুকরো পৃথিবীতে এসে পড়ে।

বলতে বলতে আমি মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে গেলুম।

বিমান দারুণ ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, কী হলো, সুনীল ? কী হলো তোর ?

আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলুম। আমিও অবাক হয়ে গেছি খুব। কী হলো কিছু বুঝতে পারছি না। এরকম তো আমার কখনো হয় না !

বিমান আমায় ঝাঁকুনি দিয়ে বলতে লাগলো, কী হলো রে, কী হলো ?

আমি বললুম, জানি না। হঠাৎ কেমন মাথাটা ঘুরে গেল।

—চুপ করে বসে থাক, উঠিস না।

—আমার কিছু হয় নি।

—তবু বসে থাক। একটা জিনিস ছাখ সুনীল, এই পাথরের নিচের ঘাসগুলো ছাখ, কেমন যেন খয়েরি হয়ে গেছে ! ঘাস চাপা পড়লে হলদে হয়ে যায়, কিন্তু খয়েরি ! তুই কখনো খয়েরি ঘাস দেখেছিস ?

—এ বোধহয় অন্য জাতের ঘাস !

—পাশের এই গাছটা ছাখ। এই গাছটার গা-টা লাল। আমি লাল রঙের গাছও কখনো দেখি নি।

—বিমান, ঐ যে মোষটা মরে যাচ্ছে, ওর জন্য আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

—আমারও খুব কষ্ট হচ্ছে রে! এমনি এমনি একটা মোষ মরে যাচ্ছে, ইস্! মোষটাকে ওর মালিক যে ফেলে গেল।

—বিমান, আমার ইচ্ছে করে এখানে শুয়ে পড়তে।

—মন্দ বলিস নি। এখানে খানিকক্ষণ শুয়ে শুয়ে কাটিয়ে দিলে বেশ হয়।

—যদি নৌকোটা চলে যায়?

—ইস্! গেলেই হলো, পুরো পয়সা দিয়েছি না। তাছাড়া যদি যায় তো চলে যাক। আমরা এখানেই থেকে যাবো।

হঠাৎ আমি লাফিয়ে উঠে পড়লুম। দারুণ জোরে চেঁচিয়ে উঠলুম, বিমান, বিমান, এই পাথরটা জ্যান্ত।

বিমান বললো, কী বলছিস? তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

—না রে, আমি সত্যি দেখলুম, পাথরটা নড়ে উঠলো!

—কী বলছিস যা-তা! পাথরটা নড়বে কী করে?

—আমি স্পষ্ট দেখলুম, পাথরটার পেটের কাছে একবার যেন চুপসে গেল, আবার ফুলে উঠলো। ঠিক ব্যাঙের মতন।

—দূর! পাথরের আবার পেট কী? তুই ভুল দেখেছিস।

—মোটেই ভুল দেখিনি।

বিমান গিয়ে পাথরটার গায়ে হাত দিতেই আমি বিমানের অন্য হাতটা ধরে এক হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে আনলুম ওকে। আমার বুকের মধ্যে হুম্-হুম্ আওয়াজ হচ্ছে। ঐ পাথরটার গায়ে হাত দিয়েই আমি মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলুম। ঐ পাথরটার কিছু একটা ব্যাপার আছে!

দূরে শুনতে পেলুম, বুড়ো মাঝি আর সুলেমান চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকছে, বাবু! বাবু!

আমি বললুম, চল্ বিমান, নৌকোয় ফিরে যাই।

বিমান বললো, নাঃ, এক্ষুনি যাবো না। এখানে শুয়ে থাকবো বললুম যে।

—না, আমার মোটেই ভালো লাগছে না। চল্, নৌকোয় ফিরে যাই।

বিমানকে প্রায় জোর করেই আমি টানতে টানতে নিয়ে চললুম। তারপর নৌকায় উঠেই বুড়ো মাঝিকে বললুম, চলো, শিগগির চলো।

নৌকায় উঠে বিমান লম্বা হয়ে শুয়ে রইলো। তার চোখদুটো ছলছল করছে। ভাঙা গলায় বললো, আমার কিছুই ভালো লাগছে না রে!

সুলেমান আমাদের দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম, ঐ দ্বীপে গেলে তোমাদের কী হয় বলো তো?

সুলেমান বললো, কী জানি, বাবু! ওখানে গেলেই মনটা যেন কেমন কেমন করে। কাজ করতে ইচ্ছে করে না। শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

বুড়ো মাঝি বললো, বাবু, আগে তো আমরা ঐ চরে যেতাম। বেশি ঝড়-বৃষ্টি হলে ওখানে নৌকো বেঁধে চালা ঘরটায় বসে জিরোতাম। অনেক লোক আগে ওখানে গরু-মোষ চরাতে আসতো। এখন আর কেউ যায় না।

—কেন যায় না বলো তো?

—ওখানে গেলেই শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। গরু-মোষগুলোও আলসে হয়ে পড়ে। কেমন যেন মনমরা লাগে!

—আমাদেরও সেই রকম লাগছিল। কিন্তু কেন হয় ওরকম বলো তো?

—কী জানি! গাছপালাগুলোও কেমন ধারা শুকিয়ে যাচ্ছে দেখলেন না? ও দ্বীপে খারাপ নজর লেগেছে।

—ওখানে একটা বড় পাথর আছে দেখেছো! আগে ওটা ছিল?

—না, আগে ছিল না। এই তো মাসখানেক ধরে দেখছি।

—কী করে পাথরটা ওখানে এলো ?

—কেউ তা জানে না। কেউ কেউ বলে, ওটা আকাশ থেকে খসে পড়েছে।

আমার মাথাটা এখনও তুর্বল লাগছে। আমি আর কথা বলতে পারলুম না। শুয়ে পড়লুম বিমানের পাশে।

হলদিয়ায় ফিরে এসে আমরা তু'জনেই সোজা চলে গেলুম বিছানায়। রাত্তিরে কিছু খেতেও ইচ্ছে করলো না। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নানা রকম তুঃস্বপ্ন দেখতে লাগলুম। তার মধ্যে বারবারই দেখতে লাগলুম সেই পাথরটাকে। ঠিক একটা ব্যাঙের মতো। তার পেটটা একবার চুপসে যাচ্ছে, একবার ফুলছে। একটা জ্যান্ত পাথর। আমি শিউরে শিউরে উঠতে লাগলুম।

সকালবেলা বিমানের দাদা, স্বপনদা জিজ্ঞেস করলেন, তোদের কাল কী হয়েছিল? সন্ধে থেকে খালি ঘুমোচ্ছিলি?

স্বপনদাকে সব কথা বলতেই হলো। স্বপনদা সবটা শুনে হো-হো করে হেসে উঠে বললো, গাঁজাখুরি গল্প বলার আর জায়গা পাস নি। একটা জ্যান্ত পাথর .... সেটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালে মন খারাপ হয়ে যায়, শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। দূর! যতসব!

বিমান বললো, দাদা, আমি পাথরটাকে নড়তে দেখিনি, সুনীল দেখেছে। কিন্তু আমারও ওখানে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল।

—বেশ করছিল। শুয়ে থাকলেই পারতিস।

—তাহলে আমাদেরও নিশ্চয়ই ঐ মোষটার মতন অবস্থা হতো।

আমি বললুম, স্বপনদা, নৌকোর মাঝিরাও কেউ ঐ দ্বীপটায় এখন যেতে চায় না। ওরাও ভয় পায়। পুলিশে একটা খবর দেওয়া দরকার।

স্বপনদা বললেন, পুলিশও তোদের কথা শুনে আমার মতন হাসবে। দেখবি, মিঃ দাসকে ডাকবো?

হলদিয়ার এস. ডি. পি. ও. মিঃ দাস স্বপনদার বন্ধু। স্বপনদা

তাঁকে টেলিফোনে ডেকে পাঠালেন। বললেন, মিঃ দাস, একবার আমার বাড়িতে চলে আসুন, ব্রেকফাস্ট খেয়ে যাবেন, আর একটা মজার গল্প শোনবো।

দশ মিনিটের মধ্যেই মিঃ দাস এসে গেলেন। তিনি বললেন, শুধু এককাপ চা খাবো। বড্ড কাজ পড়েছে, এক্ষুনি যেতে হবে। কাল রাত্তিরে একটা লঞ্চডুবি হয়েছে গঙ্গায়।

স্বপনদা বললেন, বসুন, বসুন! কাল দুপুরে এই দুই শ্রীমান নৌকো ভাড়া করে গিয়েছিল আগুনমারির চরে। সেখানে নাকি ওদের এক সাঙ্ঘাতিক অভিজ্ঞতা হয়েছে। ওরা দু'জনে···

স্বপনদাকে থামিয়ে দিয়ে পুলিশ সাহেব আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা দু'জনে কাল আগুনমারির চরে গিয়েছিলে? আশ্চর্য ব্যাপার! ঐ দ্বীপটার পাশেই তো কাল রাত্তিরে লঞ্চটা ডুবেছে। ঝড়-বৃষ্টি কিছু নেই। শুধু-শুধু একটা লঞ্চ ডুবে যাওয়া খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার!

স্বপনদা জিজ্ঞেস করলেন, কেউ মারা গেছে?

পুলিশ সাহেব বললেন, না, মরে নি কেউ। সবাইকে উদ্ধার করা গেছে। আমাদের পুলিশের লঞ্চ খুব তাড়াতাড়ি গিয়ে পৌঁছোয়। কিন্তু লঞ্চটা যে কী করে ডুবলো, তা ওরা কেউ ঠিক ঠিক বলতে পারছে না। সবাই বলছে, কী যেন হলো কিছুই জানি না, হঠাৎ একটা ধাক্কাতে লঞ্চটা কেঁপে উঠলো, তারপরই হুড়মুড়িয়ে জল ঢুকতে লাগলো।

স্বপনদা বললেন, লঞ্চটা একদম ডুবে গেছে বলতে চান?

পুলিশ সাহেব বললেন, হ্যাঁ। সেটা তোলার ব্যবস্থা করতে হবে। ঐ লঞ্চের একজন খালাসী শুধু অদ্ভুত একটা গল্প বলছে। আগুনমারির চড় থেকে একটা মস্ত পাথর নাকি উড়ে এসে প্রচণ্ড জোরে লঞ্চটাকে ফুটো করে দেয়। এরকম গাঁজাখুরি কথা কেউ শুনেছে? গঙ্গার ওপরে দ্বীপ। সেখানে পাথর আসবে কী করে? যদি-বা পাথর

থাকে, সেটা কেউ না ছুঁড়লে এমনি এমনি উড়তে উড়তে আসবেই-বা কী করে ?

স্বপনদা বললেন, এরাও ঐ দ্বীপে একটা বড় পাথর দেখেছে বলছে।

পুলিশ সাহেব বললেন, ভোরবেলা আমি আমাদের লঞ্চে সেই দ্বীপটা ঘুরে দেখে এসেছি। সেখানে পাথর-টাথর কিছু নেই। মানুষজনদের কোনো চিহ্ন নেই। একটা মরা মোষ রয়েছে দেখলুম।

আমি আর বিমান চোখাচোখি করলুম। আগুনমারির চরের পাথরটাই যে লঞ্চটাকে ডুবিয়েছে, তাতে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই!

সেই অদ্ভুত লোকটা

এক একটা মানুষের কিছুতেই বয়েসটা ঠিক বোঝা যায় না। চল্লিশও হতে পারে, পঁয়ষট্টিও হতে পারে। ঠিক এই রকমই একটা লোক বসে থাকে পার্ক সার্কাস ময়দানে প্রত্যেক শনিবার। লোকটি পরে থাকে একটা সরু পা-জামা আর একটা রঙ-চঙে জোব্বা। মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি। চোখে কালো চশমা, মাথায় একটা চ্যাপ্টা টুপি।

গনগনে রোদের মধ্যেও লোকটি পার্কের বেঞ্চে দুপুরবেলা বসে থাকে। একদৃষ্টে চেয়ে থাকে ঘাসের দিকে।

স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় দীপু মাঝে মাঝে পার্ক সার্কাস ময়দানের ভেতর দিয়ে শর্টকাট করে। লোকটিকে দেখে দীপুর কেমন যেন অদ্ভুত লাগে। একই রকম পোষাক, প্রত্যেক শনিবার ঠিক একই জায়গায় বসে কেন এই মানুষটা ? সব সময় ও একলা থাকে, কেউ ওর পাশে বসে না।

একদিন ছুটির পর বৃষ্টির মধ্যে স্কুল থেকে বেরিয়েছে দীপু। পার্কের রেলিং টপকে দৌড় লাগাতে গিয়েই আছাড় খেয়ে পড়লো। তাড়াতাড়ি উঠে ছড়িয়ে পড়া বইপত্রগুলো গুছিয়ে নিচ্ছে, এমন সময় দেখল, একটু দূরের বেঞ্চে সেই দাড়িওয়ালা, কালো চশমা পরা লোকটা তাকিয়ে আছে তার দিকে।

দীপুর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই লোকটা হাতছানি দিয়ে তাকে কাছে ডাকলো।

দীপুর এখন মোটেই বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে লোকটার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে নেই। কিন্তু এই লোকটাই বা শুধুশুধু এখানে বসে বৃষ্টিতে ভিজছে কেন ?

দীপুর কৌতূহল হল। সে এগিয়ে গেল লোকটার কাছে।

লোকটি বলল, ইস্‌টুম, কিস্‌টুম, ক্রুখ্‌ ক্রুখ্‌!

এ আবার কী রকম ভাষা? এই লোকটা কি কাবুলিওয়ালা নাকি? চেহারা দেখে তো তা মনে হয় না। লোকটির রোগা-পাতলা চেহারা। দীপু কখনো রোগা কাবুলিওয়ালা দেখে নি।

দীপু বললো, কেয়া? হাম নেই জানতা।

লোকটা এবারে দুটো আঙুল তুলে জিজ্ঞেস করলো, হিন্দী? বাংলা?

দীপু বললো, বাংলা।

এবারে লোকটা ভাঙাভাঙা উচ্চারণে বললো, বেশ কথা। হামি বাংলা জানে। এই লিজিয়ে খোঁকাবাবু, চকলেট খাও।

লোকটা তার জোব্বার পকেট থেকে একটা আধভাঙা চকলেটের টুকরো বার করে দীপুর দিকে এগিয়ে দিল।

দীপুর হাসি পেল। লোকটা কি তাকে ক্লাস সিক্স-সেভেনের ছেলেদের মতন বাচ্চা ছেলে পেয়েছে? ভুলিয়ে-ভালিয়ে ঘুমের ওষুধ মেশানো চকলেট খাইয়ে তারপর চুরি করে নিয়ে যাবে? দীপু এখন ক্লাস নাইনে পড়ে। সে ইচ্ছে করলে এই রোগা লোকটাকে ল্যাং মেরে ফেলে দিতে পারে।

দীপু বললো, আমি চকলেট খাবো না। আপনি আমায় ডাকলেন কেন?

লোকটি চকলেটটা নিজের মুখে ভরে দিয়ে বললো, তুম্‌হার নাম তো দীপক মিত্রা আছে, তাই না?

দীপু একটু অবাক হলো। লোকটা তার নাম জানলো কী করে? লোকটা তার সঙ্গে ভাব জমাতেই বা চাইছে কেন?

তবু সে বললো, মিত্রা নয়, মিত্র। আমি আর বৃষ্টিতে ভিজতে পারছি না। কী বলতে চান চটপট বলুন?

লোকটা হঠাৎ সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে ফেললো। তারপর

বললো, তুম্‌হাকে আমার খুব ভালো লাগলো। তুমি হামার বাড়িতে যাবে? বেশি দেরী হ'বে না। স্রেফ আধা ঘণ্টা থাকবে।

দীপুর মনে হলো, এ লোকটা তো তাহলে সত্যিই ছেলেধরা। স্কুলের কাছে বসে থাকে, ভুলিয়ে-ভালিয়ে ছেলেদের নিয়ে যেতে চায়।

দীপুদের স্কুলের ক্লাস-এইটের ছেলে অর্ণব সরকার গত মাসে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। তাকেও কি এই লোকটা ধরে নিয়ে গেছে নাকি?

দীপুর কিন্তু একটুও ভয় হলো না। সে বললো, আমাকে আপনার বাড়ি নিয়ে যাবেন? কেন? আমি মাছ খাই না, শুধু মাংস খাই। আলু সেদ্ধ আর ডিম সেদ্ধ একসঙ্গে মেখে খাই। দুধ আর কোকো মিশিয়ে খাই। এসব খাওয়াতে পারবেন?

লোকটা হা-হা করে হেসে উঠে বললো, বেশ তো, হামি তুমাকে মুরগ-মশল্লাম খাওয়াবো। ঠাণ্ডা লস্যি খাওয়াবো, যদি তুমি একঠো কাম করতে পারো।

ধ্যাৎ! বলে দীপু আবার চলতে শুরু করলো। লোকটা তখনও হাসতে লাগলো জোরে জোরে।

দীপু আর পেছন ফিরে তাকালো না।

একটুখানি যেতে না যেতেই কোথা থেকে একটা মস্ত বড় কুকুর তেড়ে এলো দীপুর দিকে। গলায় বেল্ট বাঁধা একটা অ্যাল্‌সেশিয়ান। কারুর বাড়ির পোষা কুকুর, হঠাৎ বেরিয়ে এসেছে।

দীপু এমনিতে কুকুর দেখে ভয় পায় না। কিন্তু এই কুকুরটা তেড়ে আসছে তার দিকেই। পার্কে আর কোনো লোকজন নেই। কুকুরের সঙ্গে ছুটেও পারা যাবে না। দীপু তাড়াতাড়ি আর একটা বেঞ্চের ওপর উঠে দাঁড়ালো।

কুকুরটাও সেখানে এসে যেই দীপুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাবে, অমনি একটা লাল রঙের দড়ির ফাঁস এসে পড়লো কুকুরটার গলায়।

দীপু দেখলো সেই কালো চশমা পরা লোকটাই দড়ি ছুঁড়ে কুকুরটাকে বেঁধে ফেলেছে। তারপর কুকুরটাকে টানতে টানতে নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে লোকটা তার গলা থেকে ফাঁস খুলে দিল, তারপর কুকুরটার মাথায় একটা চাপড় মেরে বললো, যা, ভাগ্।

অতবড় কুকুরটা এখন দারুণ ভয় পেয়ে লেজ গুটিয়ে প্রাণপণে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

লোকটা আবার দীপুর দিকে হাতছানি দিয়ে বললো, ইধারে এসো দীপকবাবু।

দীপু বললো, থ্যাঙ্ক ইউ। আমার বাড়ি ফেরার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে বললো, ভয় নেই, দীপকবাবু। এক মিনিট ঠারো, একঠো কথা বলি। তোমাকে একঠো চীজ দিতে চাই—বহুৎ দামী চীজ।

"দামী চীজ, মানে দামী জিনিস? সেটা আমাকে দেবেন কেন?"

"দেবো, তুমাকে হামার পছন্দ হয়েছে সেইজন্য। তার বদলে তুমাকেও একঠো কাম করতে হোবে। যাবে, হামার বাড়িতে?"

"না। স্কুল থেকে ঠিক সময়ে বাড়ি না ফিরলে আমার মা চিন্তা করবেন। তাছাড়া আমি বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছি। সামনেই আমার পরীক্ষা—"

"ঠিক আছে, বৃষ্টি হামি থামিয়ে দিচ্ছি। এই দেখো, এক, দো, তিন..."

হাতের সেই লাল রঙের দড়িটা শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে লোকটা পাঁচ পর্যন্ত গুণে বললো, এই দেখো, বৃষ্টিকে বেঁধে ফেলেছি হামি, এবারে রোদ উঠবে।

বৃষ্টি সত্যিই থেমে গেল, যদিও আগে থেকেই একটু কমে আসছিল।

দীপু হেসে বললো, আপনি বুঝি কুকুরের মতন বৃষ্টির গলাতেও দড়ি বাঁধতে পারেন ? হে-হে-হে ! আপনি আপনিই বৃষ্টি কমে গেছে !

লোকটি বললো, তুমাকে হামি আর একঠো চীজ দেখাচ্ছি। তুমি এই দড়িটাতে হাত দাও !

দীপু সাবধান হয়ে গিয়ে বললো, না, আমি দড়িতে হাত দেবো না !

"ঠিক আছে। ঐ গাছটায় হাত দাও !"

"কেন ? তাতে কী হবে ?"

"দিয়ে দেখো না।"

লোকটা তার হাতের দড়িটা দিয়ে গাছটার গায়ে একবার মারলো। তারপর দীপু সেই গাছটার গায়ে হাত ছোঁয়াতেই দারুণ চমকে উঠলো। দীপুর সারা শরীরটা ঝন্‌ঝন্‌ করে উঠেছে, ঠিক কারেণ্ট লাগলে যেমন হয়।

গাছের গায়ে তো কখনো কারেণ্ট থাকতে পারে না। এই লোকটা তাহলে ম্যাজিক দেখাচ্ছে দীপুকে !

দীপুর মনের কথাটা ঠিক বুঝতে পেরেই লোকটা বললো, এ সব ম্যাজিক নেহি, ম্যাজিক নেহি ! আসলি জিনিস আছে। আর একঠো দেখবে ? ঐ দেখো, আসমান দিয়ে একঠো এরোপ্লেন যাচ্ছে। যাচ্ছে তো ?

দীপু ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখলো, প্রায় তাদের মাথার ওপর দিয়েই একটা প্লেন উড়ে যাচ্ছে।

সেই লোকটা লাল দড়িটা ছুঁড়ে দিল শূন্যের দিকে, তারপর বললো, যাঃ !

প্লেনটা অমনি অদৃশ্য হয়ে গেল।

এবারে গা ছমছম করে উঠলো দীপুর। এ কার পাল্লায় পড়লো সে ! এই সময় পার্কটা এত ফাঁকাই বা কেন ? লোকটা যদি দীপুকেও ঐ দড়িতে বেঁধে ফেলে !



দীপু শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করলো, কী হলো প্লেনটার? ধ্বংস হয়ে গেল?

"না, না, ধ্বংস হবে কেন? তা হলে তো ভিতরের আদমিগুলোও মরে যাবে। হামি তো কোনো মানুষ মারি না। হামি শুধু তোমার আঁখ থেকে মুছে দিলাম এরোপ্লেনটাকে। শোনো দীপকবাবু, হামি তুমাকে যে চীজ দেবো বলছিলাম, তা কোনো আনসান্ চীজ নয়। তুমাকে দেবো আস্‌লি চীজ, তা হলো জ্ঞান। তুমি হামার কাছ থেকে এই জ্ঞান যদি নাও, তবে তুমি আন্ধারেও দেখতে পাবে, আগুন লাগলে হাত পুড়বে না, তিনদিন কিছু না খেলেও ভুখা লাগবে না, আরও অনেক কিছু পারবে।"

"ঠিক আছে, শিখিয়ে দিন!"

"আভি তো হ'বে না। দু-এক ঘণ্টা টাইম লেগে যাবে। তার আগে যে তুমাকে একঠো কাম করতে হ'বে।"

"কী কাজ বলুন?"

"তুমি হামাকে একটা দাওয়াই খাওয়াবে।"

"দাওয়াই, মানে ওষুধ?"

"হাঁ, হাঁ। হামার বাড়িতে সেই ওষুধ আছে। খুব দামী হেকিমী ওষুধ। পাঁচ ফোঁটা তাজা রক্ত মিশিয়ে সেই ওষুধ তৈয়ার ক'রতে হয়। চৌদ্দ-পনেরো বছরের বুকের রক্ত। তুমি সেইটুকু রক্ত হামাকে দেবে?"

"রক্ত!"

"হাঁ, মাত্র পাঁচ ফোঁটা। আসলি হয়েছে কি জানো, হামি তো শুধু রোদ্দুর খাই। রোদ্দুর না থাকলেই হামি দুব্‌লা হয়ে যাই। তখন ঐ দাওয়াই খেতে হয়।"

"আপনি রোদ্দুর খান?"

"হাঁ, দীপকবাবু! হামি কিছু খাবার খাই না। রোদ্দুর খেলেই হামার শরীর খুব তাজা থাকে। মুস্কিল হয় এই বর্ষাকালে।

এক একদিন রোদ্দুরই থাকে না, শুধু মেঘ! শুধু বৃষ্টি! তখন হামি দুবলা হয়ে যাই।"

"আপনি তো ইচ্ছে করলেই বৃষ্টি থামিয়ে দিতে পারেন। বৃষ্টি বন্ধ করে দিয়ে রোদ খাবেন!"

"আরে বাপ রে বাপ! সে কি কখনো হয়! বর্ষাকালে যদি বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়, তবে কত ক্ষতি হ'বে। চাষ-বাস হ'বে না। ধান গম হ'বে না। কত লোক না খেয়ে মরবে। হামার একেলার সুখের জন্য কি হামি বৃষ্টি বন্ধ করতে পারি? তুমি হামায় একটু দাওয়াই খাইয়ে দাও! স্রেফ পাঁচ ফোঁটা রক্ত।"

দীপু খানিকক্ষণ হাঁ করে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর আস্তে আস্তে বললো, এখন আপনার বাড়ি যাবো, অনেক দেরি হয়ে যাবে, আমার মা খুব চিন্তা করবেন। আমি কাল যদি আপনার বাড়ি যাই? কাল মাকে বলে আসবো যে একটু দেরি হবে।

"কাল? ঠিক আসবে?"

"হ্যাঁ, আসবো! আপনি ভাববেন না যে আমি পাঁচ ফোঁটা রক্ত দিতে ভয় পাই। আমি আজকে এখন বাড়ি যাবো।"

"তা হলে এসো কালকে!"

দীপু বারবার পেছনে তাকাতে তাকাতে চলে গেল পার্কটা পেরিয়ে। লোকটা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। বৃষ্টি নেমে গেল আবার।

দীপু অবশ্য এই ঘটনাটা বাড়িতে কারুকে বললো না। কিন্তু লোকটা তাকে দারুণ দারুণ ম্যাজিক শিখিয়ে দেবে ভেবে সে খুব উত্তেজিত হয়ে রইলো। পাঁচ ফোঁটা রক্ত তো অতি সামান্য ব্যাপার।

সেদিন বিকেল থেকে সারা রাত বৃষ্টি হলো। পরের দিনও সেই রকম বৃষ্টি। সেদিন রবিবার, দীপুর স্কুল বন্ধ। তবু বিকেলের

দিকে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার নাম করে সে চলে এলো সেই পার্কে। সেই লোকটা নেই! এত বৃষ্টির মধ্যে কেউই পার্কে আসে নি। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে চলে এলো দীপু।

এরপর পরপর কয়েকদিন চললো খুব বৃষ্টি। আকাশে রোদই ওঠে না। দীপুর খালি মনে হয়, সেই লোকটা কিছু না খেয়ে আছে। আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে। ওষুধ খাবে কী করে? অন্য কোনো ছেলে কি পাঁচ ফোঁটা রক্ত দেবে?

বৃষ্টির জন্য ইস্কুল বন্ধ রইলো দু-দিন। তার পরের শনিবার দীপু ছুটির পরেই দৌড়ে এলো পার্কে। লোকটা আজও বসে নেই তার সেই নিজের জায়গাটায়। কিন্তু সেই বেঞ্চটার ওপরে একটা লাল রঙের দড়ি পড়ে আছে।

এটা কি সেই ম্যাজিকের দড়ি? লোকটা দীপুর জন্যই রেখে গেছে? কিন্তু দীপু সেই দড়িটা ছুঁয়ে কিছুই বুঝতে পারলো না। লোকটা তো তাকে তার সেই জ্ঞান কিংবা ম্যাজিক শিখিয়ে যায় নি।

লোকটাকে আর কোনোদিন দেখতে পায় নি দীপু।

●

যাচ্ছেতাই ডাকাত

একটা কালো রঙের গাড়ি খুব জোরে এসে যেই বেঁকলো বাঁদিকে অমনি ধাক্কা লাগলো একটা সাইকেল ভ্যানের সঙ্গে। ভ্যানটা তো উল্টে গেল বটেই, গাড়িটাও ঘুরে গিয়ে উঠে গেল ফুটপাথে। একটা ল্যাম্প-পোস্টের সঙ্গে লেগে গাড়িটার রেডিয়েটার ফেটে জল পড়তে লাগলো ঝরঝর করে।

এরকম দুর্ঘটনা হলেই রাস্তায় ভিড় জমে যায়। কিন্তু তার আগেই ঝড়ের বেগে গাড়ি থেকে নেমে এলো চারজন লোক। তারা চারজনেই পরে আছে খাকি প্যাণ্ট ও কুচকুচে কালো রঙের শার্ট। মুখে রুমাল বাঁধা। তারা পরপর তিনটে বোমা ফাটালো।

ঠিক মোড়ের মাথায় পাঁচতলা বাড়ির ছাদে টেনিস বল নিয়ে ফুটবল খেলছিল টোটো আর তার বন্ধুরা। মাঝে মাঝেই বলটা রাস্তায় পড়ে যায়।

তখন যে বলটা ফেলেছে, সে ছুটে নেমে যায় বলটা আনতে, আর অন্যরা পাঁচিলের কাছে এসে উঁকি দিয়ে রাস্তাটা দেখে।

সাইকেল ভ্যান আর কালো গাড়িটার ধাক্কা লাগার ঠিক আগের মুহূর্তেই টোটোদের বলটা পড়েছে রাস্তায়। টান্টু দৌড়েছে বলটা আনতে, আর টোটোরা সাতজন রয়েছে পাঁচিলের ওপর ঝুঁকে। সেইজন্য ওপর থেকে ওরা সব ব্যাপারটা দেখলো।

গাড়ি থেকে নেমেই যারা বোমা ছোঁড়ে, তারা নিশ্চয়ই ডাকাত। তার ওপরে ওদের মুখে আবার মুখোশের মতন রুমাল বাঁধা। এক-জনের হাতে ভোজালি, আর একজনের হাতে কালো মতন কী যেন, নিশ্চয়ই রিভলভার।

প্রথম বোমার আওয়াজটা হতেই ওরা সবাই ভয় পেয়ে পেছিয়ে

এসেছিল পাঁচিল থেকে। আবার ছুটে ফিরে গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। পরের ছুটো বোমা ফাটার সময় ওরা ভয় পেল না। বরং টোটো তার বন্ধুদের সঙ্গে চোখাচোখি করলো। প্রত্যেকেরই চোখ বড় হয়ে গেছে আর ভুরু উঠে গেছে উঁচুতে। অর্থাৎ সত্যি সত্যি ওরা জ্যান্ত ডাকাতদের দেখেছে। ডাকাতরা সত্যি সত্যি ওদের চোখের সামনে বোমা ফাটাচ্ছে, ঠিক যেমন বইতে পড়া যায়।

বোমাগুলোর আওয়াজ যেমন সাংঘাতিক, সেই রকমই ধোঁয়া। ওপর থেকে টোটোদের মনে হলো একটা মেঘ যেন রাস্তা ঢেকে দিয়েছে। তবে ডাকাতরা যে ট্রাম লাইনের মোড়ের দিকে যাচ্ছে তা বোঝা যাচ্ছে ঠিকই। মেঘের তলা থেকে চারজনকে বেরিয়ে আসতে স্পষ্ট দেখতে পেল টোটোরা, তারপর সেখানে আর একটা বোমা ছুঁড়ে তারা আবার একটা মেঘ তৈরি করলো।

বাবুল্ বললো, টান্টুটা যদি রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে?

টোটো বললো, ইস্, ডাকাতরা তো আমাদের বাড়ি অ্যাটাক করলো না? তবে কোন্ বাড়ি অ্যাটাক করবে বল্ তো?

রণ বললো, নিশ্চয়ই মোড়ের মাথায় যে গয়নার দোকানটা আছে…

টোটো বললো, ঐ ছাখ, ছোটকাকা।

ট্রাম লাইনের মোড়ের দিক থেকে হেঁটে আসছেন টোটোর ছোটকাকা; বোমার আওয়াজে তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

বাবুল্ বললো, আরিব্বাস! এইবার কী হবে ছাখ! পুলিশ এসে গেছে।

টোটো বললো, দারুণ ফাইট হবে ডাকাত আর পুলিশে।

রণ বললো, যদি আমাদের গায়ে গুলি লাগে? আয়, আমরা পাঁচিলের আড়ালে বসে পড়ি।

অন্য কেউ অবশ্য তার কথা গ্রাহ্য করলো না। বরং দারুণ কৌতূহল নিয়ে দেখতে লাগলো আরও ঝুঁকে।

পাঁচতলার ছাদ থেকে ট্রাম লাইনের মোড় পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়। এখান থেকে প্রায় পঁচিশ-তিরিশখানা বাড়ি দূরে। সেখানে পুলিশের গাড়িটা এসেই থেমে গেল। তার থেকে টপাটপ সাত-আটজন পুলিশ নেমে সার বেঁধে দাঁড়ালো। একজন অফিসার রিভলভার সমেত ডান হাত তুলে কী যেন চেঁচিয়ে বললেন, তা শোনা গেল না।

ডাকাতরা আরো চারটে বোমা ফাটাল পরপর। সেগুলো পুলিশের গায়ে লাগলো, না কার গায়ে লাগলো তা বোঝা গেল না। গোটা রাস্তা ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার। তারপর সব চুপচাপ। তার মানে বোমা কিংবা গুলি-টুলির শব্দ আর শোনা গেল না, কিন্তু অনেকের চেঁচামেচি শোনা যেতে লাগলো ঠিকই।

বাবুল্ বললো, ডাকাতগুলো নিশ্চয়ই ধরা পড়ে গেছে।

টোটো বললো, অত সোজা নয়। ডাকাতরা শেষ পর্যন্ত ফাইট না করে ধরা দেয় না।

ধোঁয়া একটু কেটে যেতেই দেখা গেল, রাস্তার একদিকে ভিড় করে আছে অনেক লোক। আর একদিক থেকে অশ্বক্ষুরের মতন লাইন করে এগিয়ে আসছে পুলিশরা, মাঝখানে কেউ নেই।

টোটো বললো, একি! ড্কাতরা কোথায় গেল?

বাবুল্ বললো, ডাকাতগুলো হাওয়া।

কারুকে কিছু না বলে টোটো ছুটলো সিঁড়ির দিকে। অন্যেরাও হুদ্দাড় করে অনুসরণ করলো তাকে। প্রায় হুড়মুড় করে ওরা নেমে এল নিচে, কিন্তু বাইরে বেরুতে পারলো না।

ওদের ফ্ল্যাট বাড়ির দরজার কাছে বেশ ভিড়। দারোয়ান ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। কারুকে রাস্তায় যেতে দেওয়া হচ্ছে না। টানুটু গো-বেচারা মুখ করে এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে। বন্ধুদের দেখেই কৈফিয়ৎ দেওয়ার সুরে বললো, দেখ্ না, আমায় বাইরে যেতে দিল না, তাই বলটা আনতে পারি নি।

বাবুল্ দারোয়ানকে বললো, এখন দরজা খুলে দাও না, ডাকাতরা চলে গেছে।

সব ফ্ল্যাট বাড়িতেই যেমন একজন লোক থাকে যে নিজে নিজেই সকলের গার্জেন হয়ে যায়, এ বাড়িতেও সেরকম আছেন রাজেনবাবু। তিনি ধমক দিয়ে বললেন, না, দরজা খুলবে না। বাইরে পুলিশ ফায়ারিং করছে।

টোটো তার দলের দিকে ইশারা করলো চোখ দিয়ে, অর্থাৎ ছাদে। একটা দম্‌কা হাওয়ার মতন ওরা ফের উঠে এলো ছাদে। পাঁচিলের কাছে এসে উঁকি মেরে দেখলো, তিনদিকের রাস্তা দিয়ে পিলপিল করে লোক ছুটে আসছে এ পাড়ার দিকে। সেই ভিড়ে পুলিশরা এলোমেলো ভাবে ঘুরছে, কয়েকজন এসে দাঁড়িয়েছে অ্যাকসিডেন্ট করা কালো গাড়িটার পাশে।

ডাকাতদের কিন্তু সত্যি আর খুঁজে পাওয়া গেল না। তারা যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

রণ বললো, ধুস্, কোনো ফাইট-ই দেখতে পেলুম না। শুধু কয়েকটা বোমার আওয়াজ।

বাবুল্ বললো, পুলিশগুলো কী রে, গুলি করতে পারলো না?

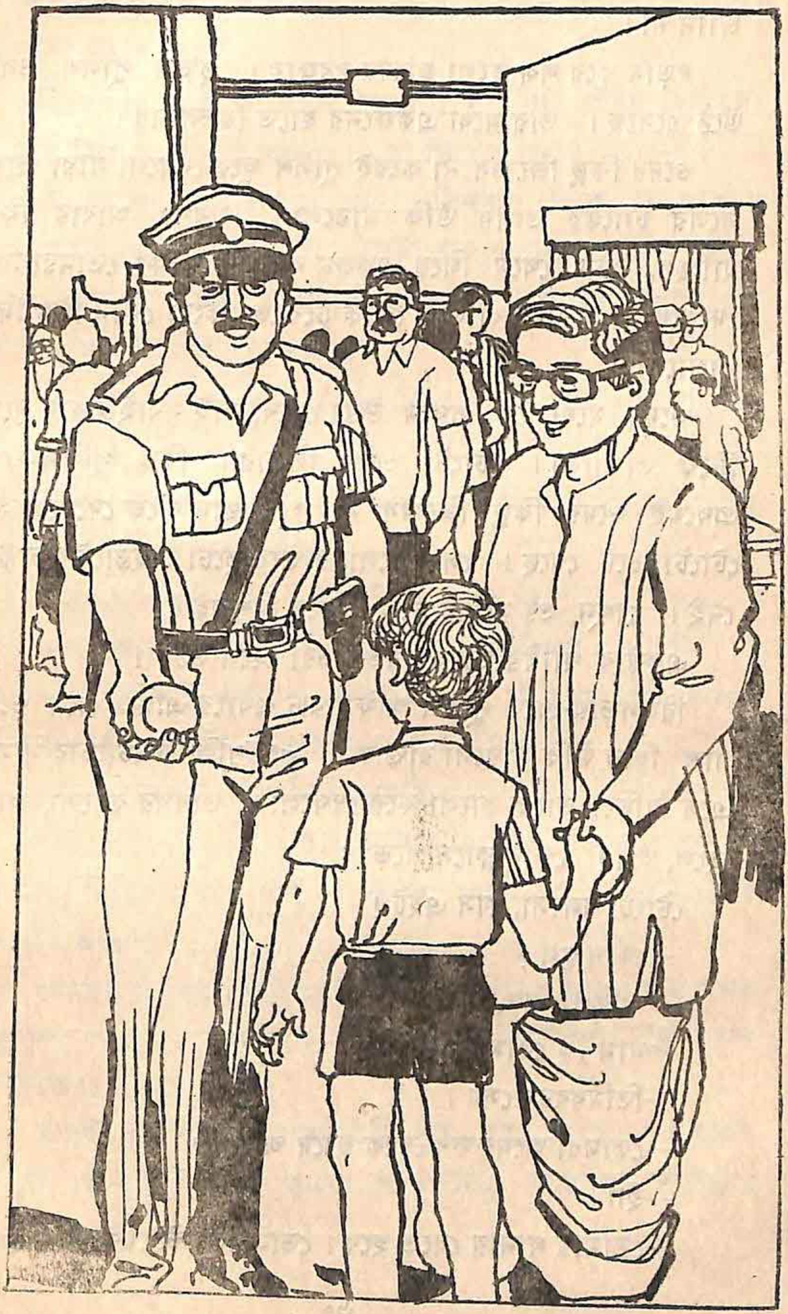
সুদীপ কম কথা বলে। সে বললো, গুলি করেছিল, ফাটেনি।

অজয় বললো, ডাকাতগুলো কোথায় গেল বল্ তো? নিশ্চয়ই এ পাড়ারই কোনো বাড়িতে ঢুকে পড়েছে।

টোটো বললো, আমাদের দারোয়ানটা ক্যাবলা। আগেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। নইলে ডাকাতরা বেশ আমাদের বাড়িতে ঢুকতে পারতো!

বাবুল্ বললো, ঐ তিনতলার রাজেনবাবুটার জন্যই তো! নইলে আমরা বেশ কাছ থেকে ডাকাতদের দেখতুম।

রণ বললো, এ বাড়িতে ঢুকলে যদি আমাদের মারতো?



টোটো বললো, অত সোজা নয়। আমরা বুঝি মারতে জানি না।

দড়াম করে শব্দ হলো ছাদের দরজায়। দু'জন পুলিশ ওপরে উঠে এসেছে। তার মধ্যে একজনের হাতে রিভলভার।

ওদের কিছু জিজ্ঞেস না করেই পুলিশ ঘুরে দেখলো সারা ছাদ। জলের ট্যাঙ্কের তলায় উঁকি মারলো। তারপর আবার ফিরে যাচ্ছিল, হঠাৎ থেমে গিয়ে একজন বললো, খোকা, তোমরা কিছু দেখেছো? কোন্ বাড়িতে লোক ঢুকেছে, কিংবা কোন্ দিক দিয়ে পালালো…

ওদের মধ্যে কে প্রথমে উত্তর দেবে, তাই সবাই সবার মুখের দিকে তাকালো। টোটো ওদের লিডার। কিন্তু পুলিশ এসে প্রথমেই ওদের কিছু জিজ্ঞেস না করে ছাদ খুঁজে দেখেছে বলে টোটো চটে গেছে। সে বললো, রাস্তায় দুটো হাইড্রাণ্টের ঢাকনা নেই। দেখুন, ওর মধ্যেই ঢুকে পড়েছে নিশ্চয়ই।

একঝাঁক পাখির ডাকের মতন ওরা হেসে উঠলো।

রিভলভার-হাতে পুলিশ অফিসারটি এবারে এগিয়ে এসে ওদের পাশ দিয়ে উঁকি মারলো রাস্তায়। অন্য পুলিশটি টোটোর সামনে এসে দাঁড়িয়ে তাকে ভালো করে দেখলো। তারপর বললো, পাকা ছেলে, অ্যাঁ! কোন্ ক্লাসে পড়ো?

টোটো বললো, ক্লাস এইট!

—কোন্ স্কুল?

—বালিগঞ্জ গভ্‌মেণ্ট।

—নাম কি তোমার?

—তিমিরবরণ সেন।

—তোমরা অনেকক্ষণ থেকে ছাদে আছো?

—হ্যাঁ।

—তোমায় থানায় যেতে হবে। তোমাকে স্টেটমেণ্ট দিতে হবে।

টোটো সগর্বে বন্ধুদের দিকে তাকালো। আজ সকালে সে কার মুখ দেখে উঠেছে। এতবড় সম্মান দেওয়া হচ্ছে তাকে। এখন তাকে পুলিশের সঙ্গে থানায় গিয়ে ডাকাত ধরার ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে।

রিভলভার-হাতে পুলিশটি বললো, না, না, এইটুকু ছেলেকে থানায় নিয়ে যাবার কী দরকার! যা জিজ্ঞেস করার এখানেই···

টোটো খুব বিরক্তভাবে সেই পুলিশটির দিকে তাকালো। এ লোকটা তো বড্ড বোকা। টোটো থানায় যেতে রাজি আছে, তাও বলে কিনা নিয়ে যাবার দরকার নেই। টোটোও জানে, কী করে এদের শায়েস্তা করতে হয়।

সেই পুলিশটি বললো, তোমরা এখান থেকে ঠিক কী দেখেছো বলো তো ?

টোটো উদাসীন ভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললো, আমি ঘুড়ির প্যাঁচ লড়া দেখছিলুম।

—বোমার শব্দ শুনে রাস্তার দিকে দেখো নি ?

—ওগুলো বোমা বুঝি ? আমি তো ভেবেছিলুম কালীপটকা!

অন্য পুলিশটি বললো, দেখলেন তো কী রকম বিচ্ছু ছেলে ? থানায় না নিয়ে গেলে মুখ খুলবে না।

বাবুল্ বললো, শুধু ধোঁয়া দেখেছি।

সেই পুলিশটি এবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, তাহলে একজনকে থানায় নিয়ে যাওয়া যাক্। এখান থেকে খুব ক্লিয়ার ভিউ পাবার কথা।

টোটোকে কিন্তু তখুনি থানায় নিয়ে যাওয়া হলো না। একজন পুলিশ তার ছোটকাকাকে বলে গেল টোটোকে নিয়ে তৈরি থাকতে।

ত্ু'ঘণ্টা ধরে পাড়ার সমস্ত বাড়ি সার্চ করা হলো। কাগজের লোক এসে ছবি নিল কালো গাড়িটার। সাইকেল ভ্যানটার

মালিকের গায়ে একটু আধটু চোট লেগেছে, বেশি ক্ষতি হয়নি। তবে তার ভ্যানের ভেতরের একুশটা মুর্গীর ডিম ভেঙে নষ্ট হয়ে গেছে। ডাকাতদের বোমার আঘাতেও কেউ আহত হয় নি। ওরা আসলে ধোঁয়ার আড়ালে পালাবার জন্যই বোমা ছুঁড়েছিল।

কিন্তু ডাকাতগুলো পালালো কী করে? একদিকে ছিল পুলিশ, আর একদিকে অনেক লোকের ভিড়, সেদিক দিয়ে যে ডাকাতরা পালায় নি, তা সবাই বলেছে এক বাক্যে। কোনো বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে। কিন্তু এ পাড়ায় সব ভালো ভালো লোক থাকে, কেউ তো ডাকাতদের আশ্রয় দেবে না। আর, কোনো বাড়ির মধ্যে জোর করে ঢুকে পড়লেও একেবারে উবে যাবে কী করে?

ডাকাতদের সম্পর্কে শোনা গেল কত রকম যে গল্প! কেউ বললো, ওরা চম্বলের ডাকাত। কেউ বললো, দিল্লীর। কেউ বললো, ওরা ব্যাঙ্ক-ডাকাত, কেউ বললো, একটু আগে পাঁচটা খুন করেছে।

একমাত্র টোটোর ছোটকাকাই পুলিশের কাছ থেকে শুনে এসেছেন পাকা খবর। এরা একেবারে নভিস্ ডাকাত। আর ওদের ভাগ্যটাও খারাপ। ওরা নিউ আলিপুরে একটা ব্যাঙ্কে ডাকাতি করতে ঢুকেছিল, কিন্তু স্থবিধে করতে পারে নি। ব্যাঙ্কের কর্মচারী ও পাড়ার লোকেরা ওদের দু'জন সঙ্গীকে ধরে ফেলে। বে-গতিক দেখে বাকিরা গাড়িতে উঠে পালাচ্ছিল। কিন্তু কাছেই ছিল একটা পুলিশের গাড়ি। সেই গাড়ি ওদের তাড়া করলো। কলকাতার অনেক রাস্তা ঘুরে শেষ পর্যন্ত এ পাড়াতেই অ্যাকসিডেন্ট করলো ওদের গাড়ি। তারপর যে কী করে ওরা অদৃশ্য হয়ে গেল সেটাই আশ্চর্যের ব্যাপার।

টোটোদের আর খেলা হলো না। টান্টুর সঙ্গে ওরা সবাই

মিলে অনেক খুঁজেও আর টেনিস বলটা পায় নি। এত লোকের ভিড়ে কে বলটা নিয়েছে কে জানে? টান্টুর খুব মন খারাপ হয়ে গেছে। যার জন্য বল হারায়, তাকেই পরের বলটা কিনে দিতে হয়। বেচারা টান্টু, গত সপ্তাহেই ওর আর একটা বল হারিয়েছিল।

টোটো ভেবেছিল, সে একলা একলা পুলিশের গাড়ি চেপে বীরের মতন থানায় যাবে। পাড়ার সব লোক তাকে দেখবে। সেরকম কিছুই হলো না। পুলিশের গাড়ি চলে গেল আগেই। সন্ধেবেলা ছোটকাকা মিনিবাসে করে টোটোকে নিয়ে গেলেন লালবাজারে।

বাস থেকে নেমে ছোটকাকা বললেন, কী ঝামেলা পাকালি বল তো? এখন কতক্ষণে ছাড়বে কে জানে? কেন ছাদে খেলতে গিয়েছিলি? আমি তখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে, পুলিশ আমাকে ধরলো না, আর তোকে ধরলো?

টোটো গম্ভীর ভাবে বললো, তুমি রাস্তায় থাকলেও তুমি তো কিছু দেখতে পাওনি। আমি সব দেখেছি।

—তুই দেখেছিস? কী দেখেছিস?

—এখন বলবো না, পুলিশ কমিশনারের কাছে বলবো।

টোটো আশা করেছিল, লালবাজারে তাকে দেখা মাত্র হৈ-হৈ পড়ে যাবে। বড় বড় সব পুলিশ অফিসাররা তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। সে এলেই তাকে নিয়ে যাওয়া হবে একটা গোপন ঘরে। সেখানে বড় বড় ফ্লাড লাইট জ্বলছে।

কিন্তু লালবাজারে অনেক ভিড়। কেউ কাউকে গ্রাহ্য করছে না। ছোটকাকা অনেক খুঁজে খুঁজে অ্যান্টি-ডেকইটি বিভাগে গেলেন। সেখানেও অনেক লোক, তার মধ্যে টোটোদের পাড়ারও কয়েকজন আছে।

একটা ঘরের মধ্যে কাকে যেন জেরা করা হচ্ছে, আর সবাই

অপেক্ষা করছে বাইরে। সকলের বসবারও জায়গা নেই। একটা মাত্র বেঞ্চ, অনেকের সঙ্গে টোটোকেও দাঁড়িয়ে থাকতে হলো। কতক্ষণ পরে যে তার ডাক আসবে তার ঠিক নেই।

এক ঘণ্টার বেশী সেখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেটে গেল, আর ছোটকাকা ক্রমেই বিরক্ত হতে লাগলেন। একবার তিনি বললেন, আমার কি ইচ্ছে করছে জানিস, টোটো? তোকে এখানে জেলে পুরে দিয়ে আমি বাড়ি চলে যাই।

টোটোর মনের তেজও অনেক কমে গেছে এতক্ষণে। সে কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো, বাঃ, আমার কী দোষ?

একটু পরেই দারুণ একটা হৈ-হৈ পড়ে গেল। ছোটাছুটি করতে লাগলো অনেকে। কে যেন বললো, ধরা পড়েছে, ধরা পড়েছে!

সত্যিই কয়েকজন পুলিশ গোল করে ঘিরে নিয়ে এলো সেই চারজন ডাকাতকে। এখন অবশ্য তাদের পোশাক অন্য। তারা পরে আছে হাফ-প্যাণ্ট আর গেঞ্জি। এই পোষাকের জন্যই বোধ হয় তাদের বেশ ছোট দেখাচ্ছে। মনে হয় যেন কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলে। একজনের বয়েস তো আঠেরোর বেশী হতেই পারে না।

ছোটকাকা বললেন, যাক্, বাঁচা গেল। আর তো দাঁড়িয়ে কোনো লাভ নেই। এবারে বাড়ি যাওয়া যাবে।

টোটো নিরাশ ভাবে বলল, আমায় কিছু জিজ্ঞেস করবে না?

ছোটকাকা ভেংচি কেটে বললেন, ডাকাত ধরা পড়ে গেছে, এখনো কি তুই পুলিশকে সাহায্য করতে চাস্ নাকি? তুই এখানে দাঁড়া, আমি গল্পটা শুনে আসি কী করে ওরা ধরা পড়লো।

সেই ঘরটার দরজার কাছে এখন অনেকে ভিড় করেছে। একজন সেপাই চেঁচিয়ে বলছে, হঠ্ যাও! তবু কেউ সরছে না অবশ্য। ছোটকাকা ঢুকে গেলেন সেই ভিড়ের মধ্যে।

একটু বাদে ফিরে এসে বললেন, জলের মতন সোজা। আমিও তাই ভেবেছিলুম, বুঝলি। ওরা ঢুকেছিল চ্যাটার্জিদের বাড়িতে।

ওদের উঠোনের পেছনে একটা পাঁচিল আছে না? সেটা ডিঙিয়ে ওরা চলে যায় পেছনের বস্তিতে। ও বাড়ির একটি বুড়ি ঝি ওদের দেখেছিল, ভয়ে কিছু বলে নি আগে। বস্তিতেও কিন্তু ওরা থাকে নি। জানে তো পুলিশ বস্তিতেও খুঁজবে। তবে বেশীদূর যেতে সাহস পায় নি। বস্তির সামনেই যে বাজার, তার একটা ঘরে ঢুকে বসেছিল। ডাকাত না ক্যাবলাক্যান্ত! যাচ্ছেতাই! চল, বাড়ি চল।

ছোটকাকা টোটোর হাত ধরে সবে মাত্র টেনেছেন, এমন সময় টোটো দেখতে পেল সেই রিভলভার হাতে পুলিশটিকে। কাকে যেন ভিড়ের মধ্যে খুঁজছে। এখন অবশ্য তার হাতে রিভলভার নেই, মুখখানিও বেশ খুশি খুশি।

টোটোকে দেখতে পেয়েই কে এগিয়ে এসে বললো, তোমরা ছাদে টেনিস বল খেলছিলে না? বলটা রাস্তায় পড়ে গিয়েছিল। তারপর খুঁজে পেয়েছিলে?

টোটো ছু'দিকে মাথা নাড়লো।

পেছনে লুকানো একটা হাত সামনে এনে পুলিশটি বললেন, এই নাও তোমাদের বল। ডাকাত ছেলেগুলোকে সার্চ করে এই বলটা আমরা পেয়েছি। আজ তো সারাদিনে ওদের কোনো রোজগার হয়নি। তাই ওদের মধ্যে যে সবচেয়ে ছোট সে রাস্তা থেকে এই বলটা কুড়িয়ে নিয়েছিল। হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ! ছোকরা নিজে আমার কাছে স্বীকার করেছে, হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ!

টোটো ছোটকাকার দিকে ফিরে ভারিক্কী চালে বললো, আমার জন্যই ওরা ধরা পড়লো কিনা, সেটা দেখলে তো!

●

পার্বতীপুরের রাজকুমার

পার্বতীপুর স্টেশনে নেমেই সুজয়ের গাটা ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল। দু'চোখের কোণ জ্বালা করতে লাগলো একটু একটু, আঙুলের ডগাও ভোঁতাভোঁতা লাগলো। জুন মাসের দুপুর, গনগন করছে রোদ, তাও সুজয়ের হঠাৎ শীত লাগলো। জ্বর আসবার সময়ে এই রকম হয়।

স্টেশনটা ছোটখাট, অতি সাধারণ। বাবা ট্রেন থেকে মালপত্র নামাচ্ছেন. মা আর দিদি একপাশে দাঁড়িয়ে বাক্স-প্যাঁটরা গুনছে। সুজয় একটু দূরে সরে গেল। ধ্যুৎ, বেড়াতে এসে জ্বর হবার কোনো মানে হয়! মা টের পেলেই বিছানায় শুইয়ে রাখবেন।

কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে ওরা উঠলো ওভারব্রীজে। মাঝামাঝি আসবার পর সুজয়ের মনে হলো ব্রীজটা কোথায় যেন ভাঙা। তক্ষুনি কুলিটি বললো, 'দেখবেন বাবু, সাবধান, সামনে দুটো কাঠ ভাঙা আছে।' সুজয় অবাক হয়ে গেল—এ কথাটা হঠাৎ তার মনে হল কেন? সে তো ভাঙা জায়গাটা দেখতে পায়নি। দুখানা তক্তা নেই সেখানে, কেউ অন্যমনস্ক থাকলে গলে নীচে পড়ে যেতে পারে।

স্টেশনের বাইরে একটিমাত্র নীল রঙের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, আর কয়েকখানা সাইকেল রিক্সা।

বাবা বললেন, 'ঐ যে আমাদের জন্য গাড়ি পাঠিয়েছে।'

বাবার বন্ধু রঞ্জিতকাকুর মামাবাড়ি পার্বতীপুরে। রঞ্জিতকাকুর মামারা একসময়ে এখানকার জমিদার ছিলেন। এখন তো আর জমিদারি নেই, কিন্তু সেই আমলের একটা প্রকাণ্ড বাড়ি আছে। বড় বড় দুটো দীঘি আর ফলের বাগান আছে। রঞ্জিতকাকু প্রায়ই

পার্বতীপুরের এই বাড়ির গল্প করতেন, তাই বাবা একদিন বলেছিলেন, 'ব্যবস্থা করে দাও না, আমরা ওখানে কিছুদিন থেকে আসি।'

রঞ্জিতকাকু বলেছিলেন, 'কোনোই অসুবিধে নেই।' তাঁর এক মামা এখনো সেখানে থাকেন। অন্য মামারা থাকেন কলকাতায়, গ্রামে আর আসতে চান না। কিন্তু তাঁর মেজমামা এখানেই থাকতে ভালোবাসেন। তিনিই এ বাড়ির দেখাশুনো করেন।

রঞ্জিতকাকু তাঁর মেজমামাকে চিঠি লিখে সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তিনি নিজেও সঙ্গে আসবেন ঠিক করেছিলেন, কিন্তু শেষ মুহূর্তে আটকে গেছেন কাজে।

একটা মস্ত বড় গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে নীল রঙের গাড়িটা। সুজয় বেশীর ভাগ গাছই চেনে না, কিন্তু এটা যে অশ্বত্থ গাছ তা সে চিনতে পেরেছে। পার্বতীপুর স্টেশনের বাইরে এরকম একটা গাছ থাকবে তাও যেন সে জানতো!

সুজয়ের একই সঙ্গে শীতও করছে, গরমও লাগছে।

গাড়ী থেকে একজন লম্বা, শুকনো চেহারার লোক নেমে বিনীতভাবে হাতজোড় করে বলল, 'মেজবাবু নিজে আসতে পারেন নি। আপনাদের ট্রেনে আসতে কোনোরকম অসুবিধে হয়নি তো? দয়া করে গাড়িতে উঠে বসুন।'

লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে সুজয়ের মনে হলো লোকটা মিথ্যে কথা বলছে।

গাড়িটা স্টার্ট নেবার সময় প্রচুর শব্দ করলো। এমন ফট্‌ফট্ দুমদাম শব্দ যেন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। কয়েকটা বাচ্চা ছেলে গাড়িটার গায়ে হাত বুলোচ্ছিল, তারা ঐ শব্দ শুনে দূরে সরে গেল ভয়ে।

একটুখানি পাকা রাস্তার পরই গাড়িটা নেমে পড়লো মাঠের মধ্যে। সেইখান দিয়েই চলতে লাগলো ধুমধামের সঙ্গে। গাড়িটা লাফাচ্ছে যেন ঘোড়ার মতন।

ড্রাইভার মুখ ফিরিয়ে বলল, 'গতবছর বন্যায় এদিককার রাস্তা সব ভেঙে গেছে তো। গাড়ি চালাবার উপায় নেই।'

বাবা বললেন, 'তাহলে গাড়ি আনলেন কেন? আমরা কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে না হয় হেঁটেই যেতুম। বেশী দূর তো নয়।'

ড্রাইভার বলল, 'না, বেশী দূর নয়, এই মাত্র মাইল পাঁচেক।'

বাবা বললেন,'অ্যাঁ! রঞ্জিত যে বলেছিল, স্টেশনের কাছেই বাড়ি!'

ড্রাইভার বলল, 'হ্যাঁ, আগে খুব কাছে ছিল, এখন যে রেল স্টেশনটা দূরে সরে গেছে!'

সুজয় বসে আছে ড্রাইভারের পাশে, তার এসব কোনো কথাই বিশ্বাস হচ্ছে না।

মিনিট দশেক যাবার পরেই গাড়িটা ক্যাঁকর-কোঁ ভুররর-ভট্‌ শব্দ করে একেবারে থেমে গেল। ড্রাইভার নেমে গিয়ে বনেট খুলে খুটখাট আরম্ভ করল।

মা বাবার দিকে ফিরে বললেন, 'আমি বলেছিলুম পুরী যেতে। শুনলে না তো আমার কথা!'

ড্রাইভার উঁকি মেরে বলল, 'উপায় নেই, ঠেলতে হবে।'

সবাই নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। রোদ একেবারে ঝাঁ-ঝাঁ করছে, তবে গতকালই বোধহয় বৃষ্টি হয়েছিল, মাঠে এখানে সেখানে জল জমে আছে। মা তো কাদার মধ্যেই পা দিয়ে ফেললেন। ড্রাইভার বলল, 'সাবধান! দেখবেন, এখানে বড্ড সাপ-খোপের উপদ্রব, কালই একজনকে সাপে কেটেছে।'

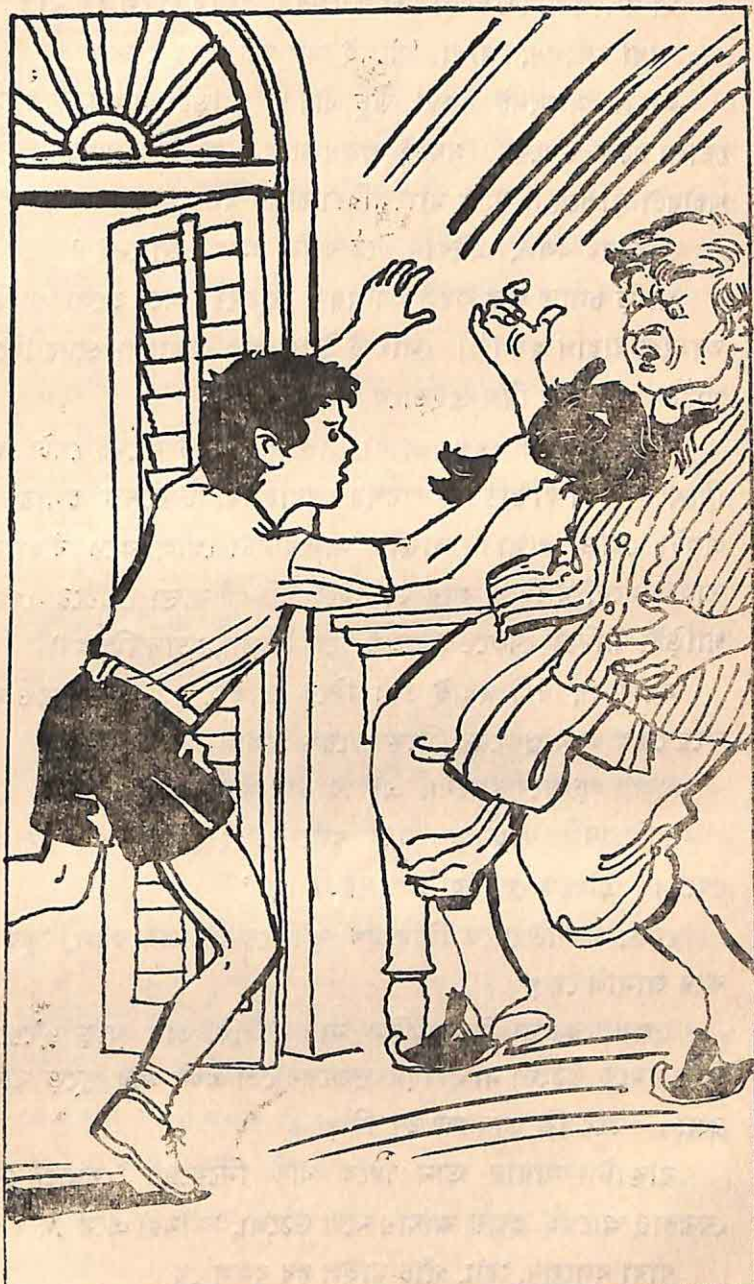
দিদি তাই শুনে এক লাফ দিল।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'সাপে কেটেছে মানে সাপে কামড়েছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কোথায়, এই মাঠে?'

'মাঠে তো সাপের কামড়ে প্রায়ই এক-আধজন মরে। কাল একজন মরেছে আমাদের রাজবাড়িতেই!'



মা বললেন, 'স্টেশনটা তো কাছেই। ফিরে গেলে হয় না?'

বাবা বললেন, 'আহা, আগেই অত ভয় পাচ্ছ কেন?'

মাঠের সামনেই একটা উঁচু বাঁধ। গাড়িটা অনেক কষ্টে ঠেলে তোলা হলো ওপরে। সবাই দারুণভাবে হাঁপাতে লাগল। সুজয়ের শরীরটা কাঁপছে। ঠিক ম্যালেরিয়া রুগীর মত।

ড্রাইভার বলল, 'এইবার উঠে বসুন, আর চিন্তা নেই।'

গাড়ি চলতে শুরু করল আবার। সুজয়ের মনে হলো, গাড়িটা আসলে খারাপ হয় নি। লোকটি ইচ্ছে করে ঠেলালো ওদের দিয়ে। মাঠটা পার করে দিল এইভাবে।

বাঁধের ওপরে বেশ ভালো রাস্তা। একটু বাদেই সেটা গিয়ে মিশেছে পাকা রাস্তায়। তারপর আবার মিনিট দশেক চলার পর একটা মোড় এলো। রাস্তার মাঝখানটা গোল করে বাঁধানো। তার সামনে, বাঁদিকে আর ডানদিকে তিনটি রাস্তা বেরিয়ে গেছে। গাড়িটা বাঁদিকে বেঁকতেই সুজয় বলে উঠলো, 'ডান দিকে।'

মা, বাবা, দিদি সবাই তার দিকে তাকালো। ড্রাইভারও ঘচ্ করে ব্রেক কষে সুজয়ের দিকে চেয়ে রইলো।

সুজয় দৃঢ়ভাবে বললো, 'এবারে ডানদিকে যেতে হবে।'

ড্রাইভারটি কাঁচুমাচু ভাবে বললো, 'হ্যাঁ, আমারই ভুল হয়ে গেছে। এদিকে তো বেশি আসা হয় না।'

পেছনের সীট থেকে দিদি মুখ ঝুঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুই কী করে জানলি রে?'

সুজয় কোনো উত্তর দিল না। দিদি তার ঘাড় ছুঁয়েছে। কিন্তু চমকে উঠলো না তো! সুজয়ের তো এখন জ্বরে পুড়ে যাবার কথা। তবে কি তার জ্বর হয় নি?

রাস্তাটা আবার ডান দিকে বাঁক নিয়েছে। সেখানে মোড় ফেরবার আগেই সুজয় আবার বলে উঠলো, 'আমরা এসে গেছি।'

বাবা বললেন, 'যাঃ, পাঁচ মাইল দূর বলল যে।'

ড্রাইভার এবার রীতিমতন ভয়ে ভয়ে সুজয়ের দিকে চোরা চাহনি দিল।

গাড়িটা ডানদিকে ঘোরার একটু পরেই দেখা গেল গাছপালার আড়ালে একটা বিশাল বাড়ি। জমিদার বাড়িকে গ্রামের লোক রাজবাড়ি বলে। সত্যি রাজবাড়ির মতন দেখতে। সামনে প্রকাণ্ড লোহার গেট, দু'পাশে দুটি গম্বুজ। গেটের পর সুরকি বিছানো পথ, তার দুদিকে নানারকম ফুলের গাছ আর পাথরের পরী। তারপর বাড়িটা যেন দুর্গের মতন।

গেট দিয়ে গাড়িটা ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সুজয় বলল, 'বাবা, এই বাড়িতে আমি আগে এসেছি।'

বাবা বললেন, 'সে কি! তুই কী করে আগে আসবি এখানে? আমি নিজেই কখনো আসিনি।'

সুজয় বলল, 'এই জায়গাটা আমার খুব চেনা। এই বাড়িটাও।'

দিদি বলল, 'এরকম অনেক বাড়ি ছবিতে দেখা যায়। দেখলেই মনে হয় চেনা চেনা।'

সুজয় বলল, 'না, সেরকম নয়, এই জায়গায় আগে এসেছি।'

মা বললেন, 'আমরা কেউ আসিনি। তুই কি একা এসেছিস?

গাড়িটা এসে থামলো বাড়ির সামনে। থাক থাক সিঁড়ি উঠে গেছে। তারপর পেতলের বল্টু লাগানো একটা মস্ত বড় কাঠের দরজা। গাড়ির আওয়াজ পেয়েও কেউ বাইরে বেরিয়ে এল না।

ড্রাইভারটি সুজয়ের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইল। সুজয় বলল, 'কী হলো, কাউকে দরজা খুলতে বলুন।'

সে চমকে গিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।' তারপর সে তরতর করে সিঁড়ি গিয়ে উঠে দিয়ে ধাক্কা গিল দরজায়। বেশ কয়েকবার ধাক্কা দেবার পর দরজা খুলে একজন লাঠিয়াল বেরিয়ে এল।

বাবা বললেন, 'আশ্চর্য তো! লাঠিয়াল বাইরে পাহারা দেবার বদলে দরজা বন্ধ করে ভেতরে বসে আছে!'

লোকটাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মেজবাবু কোথায়?'

লোকটি বাবার দিকে চেয়ে রইল, কোনো উত্তর দিল না।

সুজয় বলল, 'এই লোকটি বোবা!'

ড্রাইভার প্রায় আঁতকে উঠলো সুজয়ের কথা শুনে। ফ্যাকাসে মুখে বলল, 'আপনি কী করে জানলেন?'

এবার মা আর বাবা খুব অবাক হয়েছেন। দিদি বলল, 'সত্যি?'

ড্রাইভার বলল, 'হ্যাঁ, রঘু কথা বলতে পারে না। এই রঘু, মালপত্তর তোল।'

লোকটি লাঠি নামিয়ে রেখে দু'হাতে দুটো সুটকেস তুলে ভেতরে চলে গেল।

ড্রাইভার বলল, 'আসুন, ওপরে চলুন।'

মা বেশ বিরক্ত হয়েছেন। বাড়িতে অতিথি এলে বাড়ির লোক কেউ অভ্যর্থনা করতে আসবে না?

রঞ্জিতবাবু অবশ্য বলেছিলেন যে তাঁর মেজমামা বিয়ে করেন নি, বাড়িতে অন্য লোক আর বিশেষ কেউ নেই।

দোতলায় অনেকগুলি ঘর তালাবন্ধ। সুজয় ড্রাইভারের আগে আগে এগিয়ে গেল। তারপর বারান্দা ঘুরেই ডানদিকের প্রথম ঘরটার দরজা ঠেলে খুলে ফেলল। যেন সে জানতো যে এই ঘরটাই তাদের জন্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

শুধু তাই নয়, সুজয় এরপর বলল, 'মা, তোমাদের এই ঘর, আমি আর দিদি থাকব তিনতলায়। চল দিদি, আমাদের ঘরটা দেখে আসি।'

বাবা বললেন, 'কী ব্যাপার বল তো খোকা? তুই এসব কী বলছিস?'

সুজয় মৃদুমৃদু হাসতে লাগলো, তার চোখ জ্বলজ্বল করছে, তাকে অন্যরকম দেখাচ্ছে।

বাবা তার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'এই খোকা, কী হয়েছে তোর ?'

সুজয় বলল, 'কী জানি, বুঝতে পারছি না। আমার সব কিছুই মনে হচ্ছে আগে থেকে জানা। এ বাড়িতে আগে আমি থেকেছি।'

মা বললেন, 'ছেলেটা ক্ষেপে গেল নাকি ? এ বাড়িতে ও আগে আসবে কী করে ?'

ড্রাইভার অস্ফুটভাবে বললো, 'ছোটবাবু! ছোটবাবু!' তারপরেই সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাবা তাকে ডেকে বললেন, 'এই যে, আপনি চলে যাচ্ছেন, আপনার বাবুর সঙ্গে দেখা হলো না ?'

'বাবুর তো শরীর খারাপ। উনি ঘর থেকে বেরুচ্ছেন না।'

'ঠিক আছে। ওঁর ঘরেই আমরা যাবো।'

'উনি বলেছেন সন্ধেবেলা দেখা করবেন। আপনাদের কোনো অসুবিধে হবে না। ডাকলেই রঘু আসবে।'

'ঐ লোকটি তো বোবা! যারা বোবা হয়, তারা কালাও হয়। ডাকলে ও শুনবে কী করে ?'

'না-না, ও শুনতে পায়। কথা বলতে পারে না। আপনারা বিশ্রাম করুন। আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

মা এবারে প্রকাশ্যেই বলে ফেললেন, 'এ বাড়িতে আমার একটুও থাকতে ভালো লাগছে না বাপু। রঞ্জিতবাবু এ কোন্ জায়গায় পাঠালেন আমাদের ?'

'রঞ্জিত তো বলেছিল আমাদের খুব ভালো লাগবে। ওর মেজমামা আমাদের খুব খাতির করবেন। তিনি খুব আমুদে লোক।'

'কোথায় ! তিনি তো একবার দেখাও করলেন না !'

'শুনছি তো অসুস্থ। রঞ্জিতের চিঠির উত্তরে তিনি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে আমাদের আসতে বলেছেন।'

'তাতে তো জানান নি যে তিনি অসুস্থ! ওকি! ওকি! ছেলেটার কি হলো?'

সুজয় তখন থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে। তার চোখ বুজে গেছে।

বাবা ভয় পেয়ে গিয়ে বললেন, 'খোকা, খোকা, অমন করছিস কেন?'

সুজয় বললো, 'আমি ওপরে যাব।' তারপরেই সে এক দৌড় লাগালো।

'ওকি! ওকি!' বলে বাবা, মা, দিদিও ছুটলেন তার পেছন পেছন।

সুজয় দৌড়তে দৌড়তে উঠে এলো তিনতলায়। সেখানে ড্রাইভার আর রঘু দাঁড়িয়ে আছে একটা ঘরের দরজার সামনে। দু-জনেরই মুখ শুকনো। সুজয়কে দেখে তারা বেশ ভয় পেয়েছে।

সুজয় হুকুমের সুরে বলল, 'সরে যাও, দরজা খোলো।'

ড্রাইভার হাত জোড় করে বললো, 'ছোটবাবু! ছোটবাবু! আমার কোনো দোষ নেই!'

সুজয় এক ধাক্কা দিতেই দরজাটা খুলে গেল। একজন মাঝ-বয়সী লোক একটা সিল্কের ড্রেসিং গাউন পরে মাথা আঁচড়াচ্ছিল। আওয়াজ শুনে ফিরে তাকালো। লোকটার মাথায় টাক। মুখে কাঁচা-পাকা লম্বা দাড়ি।

সুজয়কে দেখে লোকটিও বেশ ভয় পেয়ে গেল। এক-পা এক-পা করে পিছিয়ে যেতে যেতে বলল, 'এ কে? এ কে?'

সুজয়ের বাবা-মাও ততক্ষণে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। সুজয় তাঁদের দিকে ফিরে বললো, 'এই লোকটা মেজবাবু নয়। এ লোকটা বদমাস। আগে নায়েবের কাজ করত।'

সিল্কের জোব্বা-পরা লোকটাও ড্রাইভারের মতন বলে উঠলো, 'ছোটবাবু! ছোটবাবু!'

সুজয় প্রায় লাফিয়ে গিয়ে লোকটার দাড়ি ধরে এক টান দিতেই সেই দাড়ি খুলে এল হাতে। নকল দাড়ি!

লোকটা বিকট স্বরে চিৎকার করতে লাগলো, 'ওরে বাবা রে! মেরে ফেললে রে! ভূত! ভূত! ছোটবাবু, ছেড়ে দাও আমাকে— আমি সব স্বীকার করছি।'

ড্রাইভার বললো, 'ছোটবাবু ঠিকই বলেছেন। এ মেজবাবু নয়। এ ছিল আগে এ বাড়ির নায়েব।'

রঘু আর ড্রাইভার এসে দুমদুম করে লোকটিকে ঘুষি মারতে লাগলো। সে মাটিতে পড়ে কাতরাতে লাগলো।

এরপর আস্তে আস্তে সব জানা গেল। দিন দশেক আগে এ বাড়ির মেজবাবু হঠাৎ মারা গেছেন। অন্য ভাইরা সবাই কলকাতায় থাকেন। তাঁরা সে খবর জানতে পারেননি। ঐ নায়েবই ইচ্ছে করে জানায় নি। তার বদলে সে নিজেই মেজবাবু সেজে এ বাড়ি থেকে সব জিনিসপত্র সরাবার মতলবে ছিল। বাড়ির মধ্যে বাইরের লোক বিশেষ কেউ ঢোকে না। ড্রাইভার আর রঘুকে সে ভয় দেখিয়ে নিজের দলে রেখেছিল।

নায়েব লোকটি বদমাস হলেও মোটেই সাহসী ছিল না। সুজয়কে দেখেই ভয় পেয়ে গিয়েছিল, পরে সব কথা নিজেই স্বীকার করল।

বাবা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'খোকাকে দেখে তোমরা সবাই ভয় পাচ্ছিলে কেন? ছোটবাবু বলছিলে কেন?' নায়েব আর ড্রাইভার জানালো যে এ বাড়ির যিনি বড়বাবু ছিলেন তাঁর এক ছেলে ছিল ঠিক সুজয়েরই বয়সী, দেখতেও অবিকল একরকম। বছর খানেক আগে সে কলকাতা থেকে এখানে বেড়াতে এসে সাপের কামড়ে মারা যায়। সেই ঘটনার পর থেকেই বাবুরা আর এ বাড়িতে আসেন না। মেজবাবু একলাই এখানে থাকতেন।

সুজয়কে দেখে আর তার কথাবার্তার ধরণে ওরা সবাই ভেবেছিল সেই ছোটবাবুই আবার ফিরে এসেছেন।

বাবা বললেন, 'কেউ মরে গেলে আবার ফিরে আসে কী করে? তোমাদের এইটুকুও বুদ্ধি নেই?'

ড্রাইভার বললো, 'ছোটবাবুকে তো পোড়ানো হয়নি। এ দেশের নিয়ম হচ্ছে, কাউকে সাপে কামড়ালে তার দেহ নদীর জলে ভাসিয়ে দিতে হয়। তাই করা হয়েছিল। লখীন্দর যেমন বেঁচে ফিরে এসেছিলেন, সেই রকম ছোটবাবুও নিশ্চয় ফিরে এসেছেন!

বাবা সুজয়ের কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'যাঃ, এতো আমাদের ছেলে! এ তোমাদের ছোটবাবু হবে কী করে?'

কিন্তু সুজয় কী করে এখানকার রাস্তা-ঘাট, এই বাড়ি সব কিছু আগে থেকে চিনলো? কী করেই বা জানলো যে রঘু বোবা, আর নায়েবই মেজবাবু সেজে আছে! কিছুই বোঝা গেল না। সুজয় নিজেও সে কথা বলতে পারলো না।

সুজয়ের শরীরে আর কাঁপুনি নেই। জ্বরভাবও ছেড়ে গেছে। আগের কথা আর তার কিছুই মনে নেই।

●

ইংরিজির স্যার

পুজোর ছুটি হবার মাত্র তিনদিন আগে অরূপ ক্লাসে এসে বললো, জানিস, রামগোপাল স্যার স্কুল ছেড়ে দিচ্ছেন।

আমরা সবাই একসঙ্গে অবাক হলুম।

রবীন বললো, যাঃ, কি বাজে কথা বলছিস!

আমি বললুম, হতেই পারে না!

রমেন বললো, এই অরূপটা এক-একদিন এক-একটা নতুন গুল্ ছাড়ে।

অরূপ গম্ভীরভাবে বললো, আমি না জেনে কোনো কথা বলি না। রামগোপাল স্যার কালও স্কুলে আসেন নি, আজও আসবেন না।

আমি বললুম, তা হলে নিশ্চয়ই ওঁর জ্বর হয়েছে।

পেছন থেকে শান্তনু বললো, আমি কিন্তু স্যারকে আজ সকালে কেষ্টদার চায়ের দোকান থেকে বেরুতে দেখেছি।

অরূপ বললো, দেখলি ?

ঘণ্টা বেজে গেছে, এখনো স্যার আসেন নি। প্রথম পীরিয়ডেই অঙ্ক। ভবানীবাবু স্যার একটু দেরিতেই আসেন।

রামগোপাল স্যার আর আসবেন না, এ কথাটা আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না। এই নিয়ে একটা গুঞ্জন চলতে লাগলো।'

আমাদের যে-কজন টিচার আছেন, তাঁদের মধ্যে রামগোপাল স্যারই সবচেয়ে কড়া। তাঁর ক্লাসে একটাও কথা বলা চলবে না। কেউ বাইরে যেতে পারবে না।

ক্লাসে ঢুকেই রামগোপাল স্যার দরজার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে

থাকেন। ধপধপে সাদা প্যান্ট ও সাদা ফুলশার্ট পরে থাকেন রোজ। কোনোদিন তাঁকে সামান্য একটু ময়লা পোশাক পরে স্কুলে আসতে দেখিনি। মাথায় কুচকুচে কালো চুল একেবারে নিখুঁত ভাবে আঁচড়ানো। চোখে আরশোলা রঙের ফ্রেমের চশমা। চৌকো ধরনের মুখ। উনি প্রায়ই ওঁর থুতনিতে একটা আঙুল ঠেকিয়ে থাকেন।

উনি দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকলেই সমস্ত ক্লাস একেবারে চুপ হয়ে যায়। উনি তখন গম্ভীরভাবে হেঁটে গিয়ে প্ল্যাটফর্মের ওপরে উঠে টেবিলের সামনে দাঁড়ান। তাকিয়ে দেখেন সারা ক্লাসের দিকে। তারপর গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করেন, আর ইউ রেডি ফর মি?

এই কথাটার একটা বিশেষ মানে আছে।

বছরের শুরুতেই রামগোপাল স্যার আমাদের বলে দিয়েছিলেন, যাদের পড়তে ইচ্ছে করে না কিংবা সব ক্লাস শুনতে চায় না, তারা ইচ্ছে করলে বাইরে চলে যেতে পারে। সেজন্য কারুকে তিনি শাস্তি দেবেন না। কারুর যদি ঘনঘন জল তেষ্টা পায় কিংবা বাথরুমে যেতে হয়, তাহলেও তারা আগেই বেরিয়ে যেতে পারে। মাঝখানে আর ফিরে আসতে পারবে না। তাঁর ক্লাস চলার সময় কারুর বেরুনো নিষেধ।

রামগোপাল স্যার আমাদের পড়ান ইংরিজি। অন্য সময় গম্ভীর থাকলেও পড়াবার সময় তিনি নানারকম মজার কথা বলেন, অনেক গল্পও বলেন। কিন্তু কেউ একটু শব্দ করলেই তিনি গর্জন করে ওঠেন, সাইলেন্স! আই ওয়ান্ট পিন্ ড্রপ সাইলেন্স!

এত কড়া হলেও রামগোপাল স্যারের ক্লাসই আমাদের সবচেয়ে ভালো লাগে।

অরূপ বার বার বলতে লাগলো, সে পাকা খবর এনেছে যে,

রামগোপাল স্যার আর আসবেন না। তবে কোথা থেকে যে ও খবরটা জেনেছে, তাও কিছুতেই বলবে না।

ভবানীবাবু স্যার এসে পড়তেই আমরা যে-যার সীটে গিয়ে বসে পড়লুম।

উনি প্রথমে রোল কল্ করেন। তারপর ব্ল্যাকবোর্ডে অঙ্ক কষতে শুরু করে দেন পিছন ফিরে। কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস না করলে নিজে থেকে কিছু বলেন না।

পরের ক্লাস বাংলা। আমাদের বাংলা স্যারের বয়েস বেশ কম, আর অনেকটা ভালো মানুষ ধরনের। ওঁর সঙ্গে আমাদের অনেক রকম গল্প হয়।

বাংলা স্যার পঙ্কজবাবু আমাদের রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্পটা পড়াচ্ছেন, হঠাৎ রবীন দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, স্যার, একটা কথা বলবো ?

পঙ্কজবাবু বই থেকে চোখ তুলে বললেন, বলো।

—স্যার, আমাদের রামগোপাল স্যার কি স্কুল থেকে চলে যাচ্ছেন ?

পঙ্কজবাবু একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, তা তো আমি জানি না। এ রকম কোনো কথা, তো আমি শুনিনি। হ্যাঁ, তারপর শোনো, ফটিক যখন বললো, আমি বাড়ি যাচ্ছি, তখন বাড়ি বলতে কোন্ বাড়ি বোঝাচ্ছে ?

পঙ্কজবাবু চলে যেতেই আমরা সবাই আবার ঘিরে ধরলুম অরূপকে। বললুম, গুল্‌বাজ! এবার তো ধরা পড়ে গেলি ? ইংরিজি স্যার চলে গেলে বাংলা স্যার তা জানতেন না ?

অরূপ তবু গোঁয়ারের মতন বললো, দেখি! সব সঠিক সময় জানতে পারবি। অত যদি তোদের সন্দেহ থাকে, তা হলে এবারে হেড স্যারকে জিজ্ঞেস করে ছাখ্ না।

এই ক্লাসটা নিতে এলেন হেড স্যার। তিনি পড়ান ইতিহাস।

তিনি শুধু সাল, তারিখের কচকচি শোনান, কোনো গল্প বলেন না বলে ইতিহাসের ক্লাস শুনতে আমার ভালো লাগে না। তবে হেড স্যারকে সবাই ভয় পায়। হেড স্যার রেগে গেলেই বাড়িতে চিঠি যাবে।

হেড স্যারকে কে জিজ্ঞাসা করবে ঐ কথাটা? সবাই ভয় পাচ্ছে। আমরা একজন আর একজনের সঙ্গে চোখাচোখি করছি কিন্তু কেউ উঠে দাঁড়াচ্চি না।

ক্লাসের একেবারে শেষদিকে অরূপ নিজেই উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, স্যার, আমাদের ইংরিজির টিচার রামগোপাল স্যার চলে যাচ্ছেন বুঝি?

হেডমাস্টার মশাই স্থিরভাবে তাকালেন অরূপের দিকে। মনে হলো রেগে গেছেন। তারপর বললেন, হ্যাট ইজ নান্ অফ ইয়োর বিজনেস্।

হেড স্যার চলে যাবার পর অরূপ বললো, দেখলি, হেড স্যার স্বীকার করলেন কিনা?

কিন্তু হেড স্যারের ঐ কথাটাতে যে ঠিক কি বোঝায়, তা আমরা বুঝলুম না। উনি হ্যাঁ-ও বলেন নি, না-ও বলেন নি।

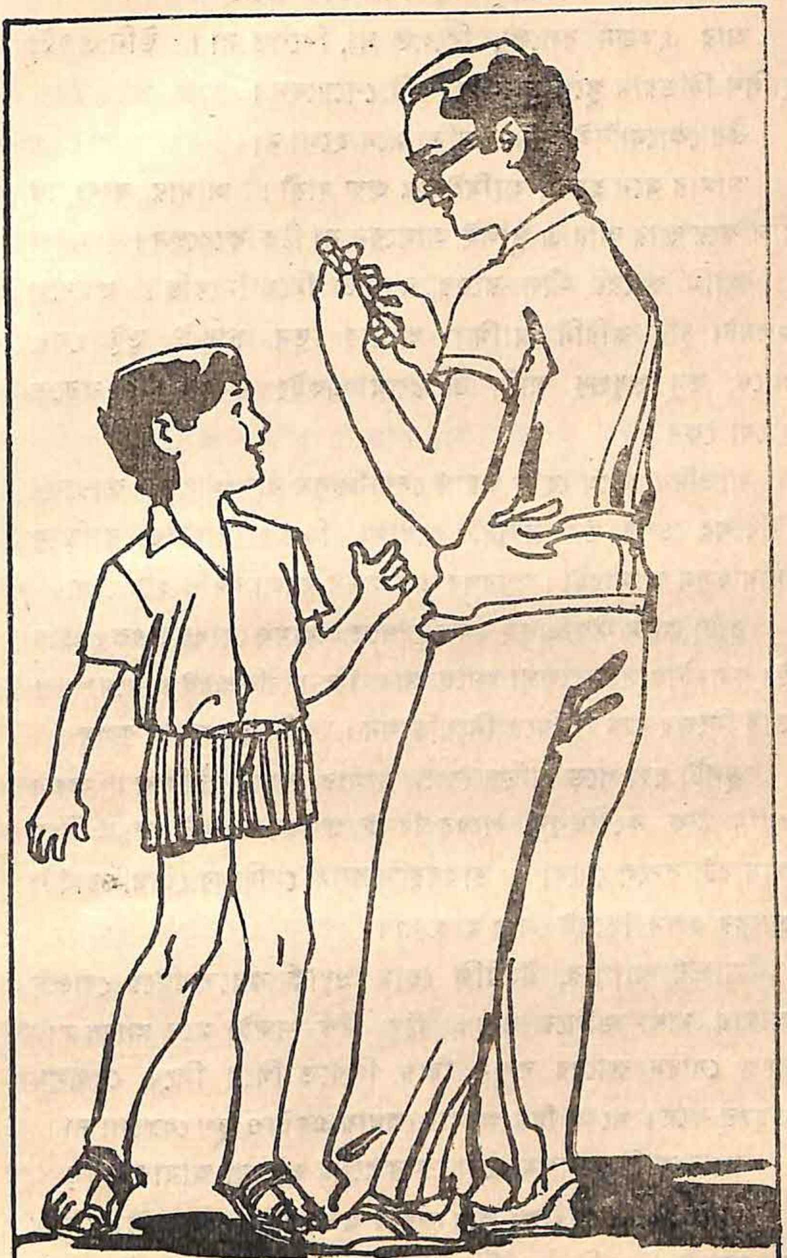
কিন্তু রামগোপাল স্যার চলে যাবেন কেন?

পরদিনও রামগোপাল স্যার এলেন না। অরূপ ছাড়া আজও তিন চারজন বললো, তারাও শুনেছে রামগোপাল স্যার সত্যিই আর থাকছেন না এই স্কুলে। আর তিনি আসবেন না কোনোদিন।

আজ আমার মনে হলো, এরা বোধহয় সত্যি খবরই বলছে। আমার বুকটা কাঁপতে লাগলো। নিজেকে মনে হলো, দারুণ একটা অপরাধী।

আমি ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞেস করলুম, স্যার কেন চলে যাচ্ছেন রে?

একজন বললো, হেডুর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। হেড মাস্টার মশাই ওকে দেখতে পারতেন না, জানিস না?



আর একজন বললো, উনি বিলেত চলে যাচ্ছেন।

আর একজন বললো, বিলেত না, বিলেত না। উনি একটা ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে ভালো চাকরি পেয়েছেন।

এর কোনোটাই আমার সত্যি মনে হলো না।

আমার মনে হলো, আমিই এর জন্য দায়ী। আমার ব্যবহারে রাগ করে স্যার আর এ স্কুলেই আসবেন না ঠিক করেছেন।

আমি স্যারের নীল রঙের কলমটা নিয়ে নিয়েছি। তা বলে কলমটা চুরি করিনি আমি। আমার তিন চারটে ডট্ পেন আছে, তবু শুধুশুধু আমি ঐ রকম একটা কলম চুরি করতে যাবো কেন?

সাতদিন আগে হোম ওয়ার্ক দেখাচ্ছিলুম রামগোপাল স্যারকে। টেবিলের ওপর ওঁর কলমটা খোলা ছিল। আমিও বাড়িয়ে দিয়েছিলুম আমারটা। তারপর এক সময় বদলা বদলি হয়ে গেল।

দুটো কলম ঠিক একই রকম দেখতে। দামও বোধহয় এক। তবে ওঁর কলমটার গায়ে লেখা আছে আর. জি.। নিশ্চয়ই রামগোপাল স্যার নিজের নাম লিখিয়ে নিয়েছিলেন। এটা ওঁর শখের কলম।

ভুলটা ধরা পড়ে রাত্তির বেলা আমার পড়ার টেবিলে। তখন আমি ঠিক করেছিলুম, পরের দিনই স্যারের কলমটা ফেরত দিয়ে আমারটা বদলে নেবো। তারপর ভাবলুম, সেদিনের হোম ওয়ার্কটা স্যারের কলম দিয়েই লেখা যাক না।

আশ্চর্য ব্যাপার, ইংরিজি হোম ওয়ার্ক করতে গিয়ে রোজই আমার মাথা গুলিয়ে যায়। ঠিক ঠিক শব্দটা মনে আসে না। কিন্তু সেদিন স্যারের কলম দিয়ে লিখতে গিয়ে লিখে ফেললুম তর্তর্ করে। পরের দিন আমার লেখায় একটাও ভুল বেরুলো না।

তখন আমি ভাবলুম, এটা কি কলমের গুণ, না আমার গুণ?

আর একবার পরীক্ষা করে দেখার জন্য সেদিন আর ফেরত দিলুম না কলমটা। সেদিনও বাড়িতে গিয়ে সব লেখা লিখলুম সেই কলমটা

দিয়ে। শুধু ইংরিজি নয়, অন্য সাবজেক্টও অনেক সোজা লাগলো। পরের দিন আবার সব কটা খাতাতেই ফুল মার্কস পেলুম।

সেইজন্যই আর ফেরত দেওয়া হয়নি কলমটা। স্যারের এই কলমে নিশ্চয়ই কিছু বিশেষত্ব আছে। এই কলম থাকলে আমি ফার্স্ট হয়েও যেতে পারি।

স্যার নিশ্চয়ই এতদিনে বুঝে গেছেন যে তাঁর কলমটা অন্য কেউ নিয়ে নিয়েছে। কে নিয়েছে তা বুঝতে পারেন নি নিশ্চই। কিন্তু তাঁর ছাত্ররা নিজের থেকে কলমটা ফেরত দেয়নি বলে মনে দুঃখ পেয়েছেন, সেইজন্য আর স্কুলে আসছেন না।

সারা বিকেল আমার মন খারাপ হয়ে রইলো। খেলতে যেতে ইচ্ছে করলো না। সন্ধেবেলা পড়ায় মন বসলো না। রামগোপাল স্যারের বাড়ি বেশি দূরে নয়। কারুকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়ে ছুটতে লাগলুম।

স্যারের বাড়ি দূর থেকেই দেখেছি, কোনোদিন ভেতরে ঢুকিনি। জানি, স্যার দোতলায় থাকেন। দোতলায় সব ঘরে আলো জ্বলছে।

বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে রইলুম খানিকক্ষণ। স্যার নিশ্চয়ই খুব রেগে আছেন, আমায় দেখে যদি আরও রেগে যান? আমি কখনো কোনো মাস্টার মশাইয়ের কাছে বকুনি খাইনি।

শেষ পর্যন্ত উঠে গেলুম সিঁড়ি দিয়ে।

স্যারের বসবার ঘরে অনেক লোক। স্যারের বন্ধু নিশ্চয়ই সবাই। স্যার পরে আছেন একটা পায়জামা আর গেঞ্জি। সাদা প্যাণ্ট শার্ট ছাড়া স্যারকে আমি কখনো দেখিনি। তাই স্যারকে অন্যরকম দেখাচ্ছে।

একবার ভাবলুম, কলমটা দরজার কাছে রেখে চলে যাই। কিন্তু তার আগেই স্যার আমায় দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কে?

তিনি উঠে এলেন দরজার কাছে। আমি আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম দেওয়াল ঘেঁষে। আমার বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ করছে।

আমায় দেখে চিনতে পারলেন স্যার। তিনি বললেন, আরে, তুমি বরুণ মৌলিক না, ক্লাস এইটের? কী ব্যাপার? এসো, এসো, ভেতরে এসো!

আমি সেখান থেকে নড়তেও পারলুম না। আমার গলা থেকে কথাও বেরুলো না।

আমার কাঁধে হাত রেখে স্যার বললেন, কী হয়েছে, বরুণ? আমায় কিছু বলবে?

আমি পকেট থেকে কলমটা বার করে দিয়ে বললুম, স্যার, আপনার এই কলমটা আমার কাছে ছিল, ফেরত দেওয়া হয় নি।

স্যার অবাক হয়ে বললেন, আমার কলম! কিন্তু আমার তো কোনো কলম হারায় নি।

—এটা আমার সঙ্গে বদলা-বদলি হয়ে গিয়েছিল।

—ও, তাই নাকি? তার মানে তোমারটা আমার কাছে? একই রকম দেখছি।

—স্যার, আমায় ক্ষমা করুন। আপনারটা স্পেশাল কলম, এতে আপনার নাম লেখা···

—স্পেশাল! নাম লেখা? দেখি তো?

কলমটা নিয়ে তিনি ঘুরিয়ে দেখে বললেন, এতো বোধহয় কোম্পানীর নাম। আমার নামের সঙ্গে মিলে গেছে। আমি তো আগে লক্ষ্যই করি নি। এটা তুমি ফেরত দিতে এলে? নাঃ, এটা তুমিই রাখো।

—স্যার, আপনি আমাদের ইস্কুলে আর আসবেন না? আপনি রাগ করেছেন আমাদের ওপর···

আমি আর বলতে পারলুম না, মুখটা নিচু করলুম।

স্যার বললেন, আমি দিল্লিতে একটা কাজ পেয়েছি, সেখানে চলে যেতে হচ্ছে। একি বরুণ, তুমি কাঁদছো? তুমি এই রাত্রে···

স্যারও থেমে গেলেন হঠাৎ। একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

তারপর বাঁ হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মুছে ধরা গলায় বললেন, আমি তো আসবো মাঝে মাঝে। যখনই কলকাতায় ফিরবো, তোমরা এসো দেখা করতে…

আমার কান্না থেমে গেছে। আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম স্যারের দিকে। ওনার মতো কড়া মানুষও যে আমাদের মতন কাঁদতে পারেন, তা কোনো দিন স্বপ্নেও ভাবিনি।

সেদিনই বুঝলুম, মানুষকে নতুন নতুন ভাবে চেনা যায়।

●

জ্যান্ত খেলনা

বারান্দায় বসে গল্প করছিল সবাই, এমন সময় দীপু ছুটতে ছুটতে সেখানে এলো। তার হাতে একটা শুকনো গাছের ডাল। দীপুর মুখ-চোখ উৎসাহে জ্বলজ্বল করছে। সে যেন হঠাৎ আবিষ্কার করেছে একটা নতুন কিছু।

শুকনো ডালটা উঁচু করে তুলে সে চেঁচিয়ে বললো, মা, দেখো কি সুন্দর একটা জিনিস পেয়েছি!

বড়রা গল্প থামিয়ে তাকালো দীপুর দিকে। তার হাতে শুধুই একটা শুকনো গাছের ডাল। সুন্দর কিছু না।

মা বললেন, দীপু, তুই আবার একলা একলা বাগানে গিয়েছিলি ?

বাবা বললেন, সেই জন্যই অনেকক্ষণ দীপুকে দেখতে পাইনি!

বাড়ির পেছনেই বেশ বড় বাগান। বাগান মানে অবশ্য শুধু ফুল গাছের বাগান নয়। বড় বড় আম গাছ আর নারকেল গাছে ঘেরা অনেকখানি জায়গা। আরও অনেক রকম গাছ আছে। কেউ যত্ন করে না। আগাছা জন্মে গেছে মাটিতে। বাগানের মধ্যে একটা পুকুরও আছে, সেটাও কচুরি পানায় ভর্তি।

দীপুর বড় মামাদের এই গ্রামের বাড়িতে এখন আর বিশেষ কেউ থাকে না। এবার দীপুরা সবাই বেড়াতে এসেছে।

বড় মামা বললেন, ও বাগানে খেলুক না। ভয় তো কিছু নেই।

মা বললেন, যদি সাপ-টাপ থাকে।

বড় মামা বললেন, তোর কি বুদ্ধি! শীতকালে বুঝি সাপ বেরোয় ?

মা তবু নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। বললেন, তা হোক, এই

তুপুর বেলা বাগানে একলা একলা থাকা ভালো নয়। একটা পুকুর আছে, যদি পড়ে টড়ে যায়।

দীপু তাড়াতাড়ি বললো, না, আমি পুকুরের কাছে যাইনি।

বাবার বন্ধু অমলকাকু এক পাশে বসে চুরুট টানছিলেন। তিনি বললেন, দীপু, তুমি কি সুন্দর জিনিস এনেছো ?

দীপু গাছের ডালটা এগিয়ে দিয়ে বললো, দেখুন অমলকাকু, এটা খুব সুন্দর না ? আমি আগে আর এরকম একটাও পাইনি!

বাবা বললেন, এটার মধ্যে আবার সুন্দর কি আছে ?

প্রায় এক হাত লম্বা একটা আম গাছের ডাল। ওপরের দিকে কয়েকটা শুকনো পাতা তখনো আছে, মাঝখান দিয়ে আবার তুটো শুকনো ডাল তু'দিকে বেরিয়েছে।

দীপু বললো, দেখুন, দেখুন, এটা ঠিক মানুষের মতন দেখতে না ?

অমলকাকু বললেন, তাই নাকি!

দীপু জোর দিয়ে বললো, দেখতে পাচ্ছেন না, অবিকল ছোট মামার মতন!

সবাই হো-হো করে হেসে উঠলো একসঙ্গে। শুধু দীপুর ছোট মামা হাসতে পারলেন না। ছোট মামার চেহারাটা রোগা আর লম্বা, মাঝে মাঝে ওপরের দিকে হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙেন। তাঁর চেহারা সম্পর্কে কেউ ঠাট্টা করলে তিনি রেগে যান।

অমলকাকু হাসতে হাসতে বললেন, ঠিকই বলেছে কিন্তু! এ ছেলে দেখছি বড় হলে নির্ঘাৎ আর্টিস্ট হবে।

মা বললেন, আর্টিস্ট হবে না ছাই। এই এক অদ্ভুত খেলা আছে ছেলেটার!

অমলকাকু ছোট মামাকে আরও রাগাবার জন্য বললেন, কিন্তু যাই বলো তোমরা, আমি কিন্তু খুব মিল দেখতে পাচ্ছি।

ছোট মামা মনের ভুলে ঠিক সেই সময়েই আড়মোড়া ভাঙার জন্য হাত তুটো উঁচু করলেন। সবাই হেসে উঠলো আবার।

দীপু বললো, মা, আমি কিন্তু এটা নিয়ে যাবো বাড়িতে।

আর কিছু না বলে দীপু লাফাতে লাফাতে চলে গেল তার ঘরের দিকে।

মা বললেন, ছেলেটা যত রাজ্যের জঞ্জাল এনে জমাচ্ছে ঘরে। এ সব নাকি আবার নিয়ে যেতে হবে।

বাবা বললেন, কালকে একটা কাঠের টুকরো কুড়িয়ে এনে বলছিল সেটাকে নাকি দেখতে একেবারে জগন্নাথের মতন।

অমলকাকু বললেন, ভুল তো বলেনি তাহলে। দারু ভূতে মুরারি।

মা বললেন, কেন, সেই যে আর একটা কঞ্চি এনে একবার বলেছিল সেটা ওর ঠাকুমা।

এইসব গল্প করতে করতে বড়রা আবার বড়দের গল্পে ফিরে গেলেন।

আর কোনো ছোট ছেলে মেয়ে নেই বলে এখানে দীপুকে খেলা করতে হয় একলা একলা। মা বারণ করলেও সে টুকটুক করে লুকিয়ে চলে যায় বাগানে। সে যে পুকুরটার কাছে নেমে একবার জলে পা দিয়ে এসেছে, মা সে কথাও জানেন না।

বাগানটা খুব ঠাণ্ডা। এতসব বড় বড় গাছ, তাদের ডালে পাতায় হাওয়া লেগে লেগে কত রকম সব মিষ্টি মিষ্টি শব্দ হয়। দীপুর মনে হয়, গাছগুলো যেন বেশ মানুষ, সবাই তাকে দেখছে। পাতা দুলিয়ে দুলিয়ে কি যেন কথা বলতে চাইছে তার সঙ্গে। অনেক রকম পাখিও আছে এখানে। পাখিদের সঙ্গে গাছেদের খুব ভাব, কক্ষনো ওরা ঝগড়া করে না। পাখিগুলো সব সময় ব্যস্ত। হয় ফুরৎ ফুরৎ করে উড়ছে কিংবা বসে বসে ডাকছে। একটা পাখি অনেকক্ষণ ধরে কুং কুং কুং করে ডাকে, সেটাকে কিছুতেই দেখতে পাওয়া যায় না।

সবচেয়ে বড় আম গাছটার নীচে দুটো ছোট্ট গাছ। দীপুরই

সমান লম্বা। দীপু ওদের নাম দিয়েছে অরিজিৎ আর সুমন্ত্র। ঐ নামে দীপুর ইস্কুলের দু'জন বন্ধু আছে। গাছ দুটোকে দীপু ঐ নাম দিয়ে ওদের সঙ্গে নিশ্চিন্তে খেলা করে।

দীপু বলে, জানিস ভাই, আমি টিনটিনের বইগুলো আনতে ভুলে গেছি। তোরা কি টিনটিনের নতুন বই পেয়েছিস ? আমাকে দিবি তো ?

গাছগুলো হাওয়ায় দোলে। ঠিক যেন মাথা নাড়াচ্ছে।

দীপু আবার বলে, কাল রাত্তিরে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল, তখন শুনলুম কিসের যেন একটা শব্দ হচ্ছে বাইরে। আমি মাকে ডাকিনি, বাবাকেও ডাকিনি। ভাবলুম কি, নিজেই একলা একলা বাইরে গিয়ে দেখবো। একটুও ভয় পাইনি, সত্যি ! যেই খাট থেকে নেমেছি, অমনি শব্দটা থেমে গেল। জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখি, একটা বেড়াল। আমাকে দেখেই পালালো। ওটা কিন্তু আসলে বেড়াল নয়। নিশ্চয়ই মিশমিদের সর্দার এসেছিল, সেই যে, যে ইচ্ছে করলেই অন্যরকম চেহারা নিতে পারে—আমাকে দেখেই বেড়াল হয়ে গেল, বুঝলি ?

এই রকম গল্প করতে করতেই দীপুর সময়টা কেটে যায়। মাঝে মাঝে দু'একটা প্রজাপতি এসে বসে সেই ছোট গাছ দুটোতে। তখন দীপু কথা থামিয়ে সেই দিকে চেয়ে থাকে। একটা প্রজাপতির নাম সে দিয়েছে 'বুবাই'। ওটা ওর মাসতুতো বোনের নাম।

একবার দিপু দেখলো, অরিজিৎ নামের গাছটার গা বেয়ে বেয়ে একটা শুঁয়োপোকা উঠছে। দীপু খুব রেগে গেল সেটা দেখে। সে ধমক দিয়ে বললো, এই, তুমি আমার বন্ধুর গায়ে উঠছো কেন ? শিগগির নামো।

শুঁয়োপোকাটা এমন পাজি যে কোনো কথাই শোনে না।

দীপু তখন একটা কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে সেটাকে মাটিতে ফেলে

দেয়। শুঁয়োপোকাটার নাম দেয় সে কুম্ভকর্ণ, তারপর অনেকক্ষণ ধরে সেটার সঙ্গে লড়াই করে। সেটাকে হারিয়ে দিয়ে দীপু আবার বাড়িতে ফিরে আসে মাকে খবরটা জানাবার জন্য।

দীপুর মামারবাড়ির গ্রামের খুব কাছেই বক্রেশ্বর। সেখানে গরম জলের ফোয়ারা আছে। পরের দিন সবাই সেখানে বেড়াতে যাবে। দীপু যেতে চায় না। তার বেশী ভালো লাগে ঐ বাগানে খেলা করতে। কিন্তু দীপুকে একা রেখে যেতে মা রাজি হলেন না। দীপুকে যেতেই হলো। গিয়ে অবশ্য একটা লাভ হলো। সেখানে দীপু একটা পাথরের টুকরো পেয়ে গেল, সেটাকে দেখতে একদম স্বতপা মাসীর মতন। ঠিক সেই রকম হাসি হাসি মুখ। পাথরটা সঙ্গে করে নিয়ে এলো দীপু।

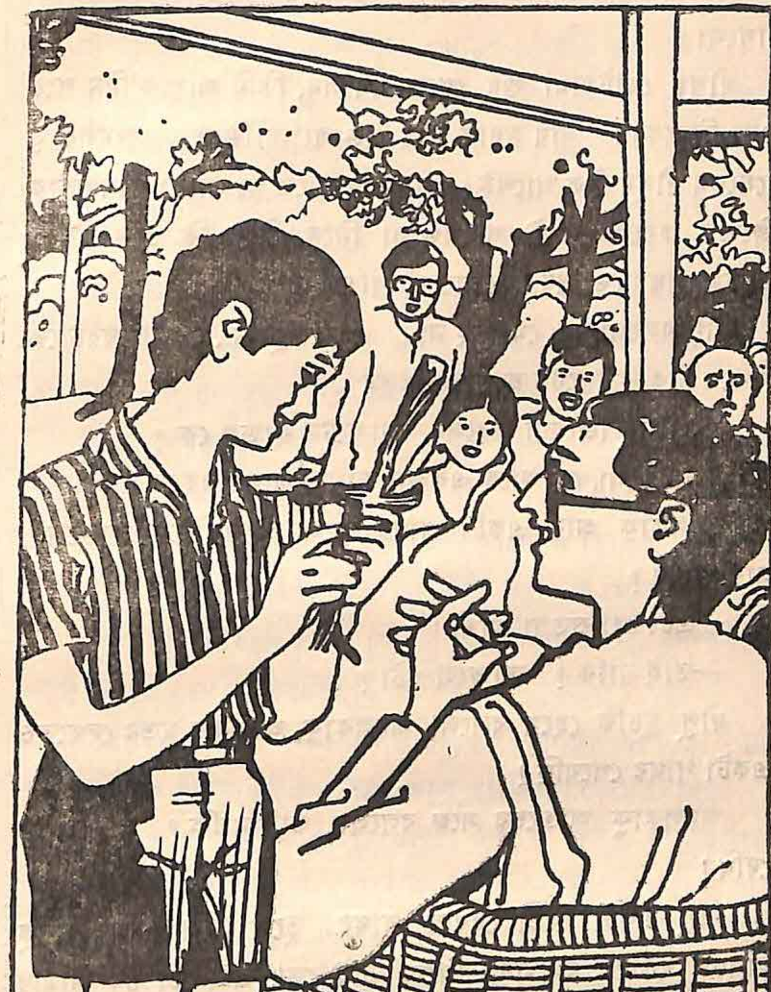
সাতদিন কেটে যাবার পর, এবার কলকাতায় ফিরতে হবে। বাবার অফিসের আর ছুটি নেই। ফেরা হবে বড় মামার গাড়িতে। মালপত্তরে একেবারে বোঝাই হয়ে গেছে গাড়ি। সবাই এক বস্তা করে নারকেল নিয়েছে। তার ওপরে আবার ঝুড়ি ঝুড়ি পাটালি গুড়। এর ওপর আছে আবার দীপুর নিজের জিনিস। সাতটা গাছের ডাল, তিনটে কঞ্চি আর চারখানা পাথরের টুকরো। বড়দের সব জিনিসপত্তর ঠিক ঠিক তোলা হলো, শুধু দীপুর জিনিসগুলো নেবার বেলাতেই গাড়িতে জায়গা কম পড়ে যায়।

বাবা বললেন, এই সব আজে বাজে জিনিসগুলো নিয়ে কি করবি ? ওগুলো ফেলে দে।

দীপু কিছুতেই রাজি নয়। এগুলো তার খেলার জিনিস, সে কিছুতেই ফেলে যাবে না।

দীপু প্রায় কেঁদে ফেলছে দেখে মা বললেন, যাক্‌গে, নিতে চাইছে যখন নিয়ে যাক।

গাছের ডালগুলো রাখা হলো গাড়ির মাথায় ক্যারিয়ারে,



বিছানা-পত্তরের পাশে। পাথরগুলো দীপু নিজের পায়ের কাছে রাখলো।

দীপুর ছোটমামা শুধু থেকে গেলেন, তিনি আর ক'দিন পরে একা ফিরবেন। আর সবাই উঠে পড়লো গাড়িতে। অমলকাকু বসেছেন দীপুর ঠিক পাশেই। পাথরগুলোতে পা লাগায় অমলকাকু জিজ্ঞেস করলেন, এই পাথরগুলো নিয়ে গিয়ে কি হবে দীপু? এরকম পাথর তো সব জায়গাতেই পাওয়া যায়।

দীপু বললো, না, মোটেই না। এই দেখুন না, এই পাথরটাকে দেখতে ঠিক ক্যাপটেন হ্যাডকের মতন।

অমলকাকু জিজ্ঞেস করলেন, ক্যাপটেন হ্যাডক কে?

দীপু বললো, সে আছে একজন আমার গল্পের বইতে।

অমলকাকু আর একটা পাথর তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আর এইটা?

—এটা তো স্ুতপা মাসী।

—তাই নাকি? তা হলে ওটা?

দীপু মুচকি হেসে বললো, অমলকাকু, আপনার মতন দেখতেও একটা পাথর পেয়েছি!

অমলকাকু আগ্রহের সঙ্গে বললেন, তাই নাকি? কই, দেখি দেখি!

দীপু একটা বিশ্রী দেখতে পাথর তুলে দিল। অমলকাকু হাসতে হাসতে বললেন, আরে, তাই তো, এটা তো ঠিক আমার মতন অবিকল দেখতে!

সবাই দারুণ হাসতে লাগলো। বড় মামা গাড়ি চালাতে চালাতে এমন হাসতে লাগলেন যে আর একটু হলে গাড়িটা রাস্তার পাশে গড়িয়ে যেত। কেউই কিন্তু পাথরটার সঙ্গে অমলকাকুর মুখের কোনো মিল খুঁজে পাচ্ছে না।

বাবা বললেন, ছেলেটা একেবারে পাগল। কি যে ওর খেলা!

অমলকাকু বললেন, না, না, পাগল কেন হবে? আর্টিস্টস এরকম অনেক কিছু দেখতে পায়, আমরা সাধারণ লোকরা তা পাই না।

বেশ কিছুক্ষণ গাড়ি চলার পর অমলকাকুর চা খেতে ইচ্ছে হলো। গাড়ি থামানো হলো সেইজন্য। চায়ের দোকানের কাছে সবাই গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালো। অন্যদের হাতে চায়ের কাপ, দীপু নিয়েছে বোতলের সরবৎ।

সেখানে একজন মেয়ে কতকগুলো বড় বড় রং করা বেতের ঝুড়ি বিক্রি করছিল। অমনি মায়ের একটা পছন্দ হয়ে গেল। যে-কোনো জায়গা থেকে জিনিস কেনা মায়ের স্বভাব।

কিন্তু অতবড় ঝুড়িটা নেওয়া হবে কোথায়? গাড়ির মাথাতেই বেঁধে নিতে হবে। বাবা আর অমলকাকু সেটা বাঁধাবাঁধি করছেন, হঠাৎ দীপু চীৎকার করে ছুটে এসে কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, একি, কি করলে? ছোট মামার হাতটা যে ভেঙে গেল!

সবাই অবাক হয়ে থমকে গেল। চায়ের দোকানের লোকগুলো পর্যন্ত অবাক হয়ে তাকিয়েছে।

তারপরই বোঝা গেল ব্যাপারটা। ঝুড়িটা রাখতে গিয়ে ঠেলাঠেলিতে দীপুর একটা গাছের ডাল খানিকটা ভেঙে গেছে।

বাবা আর অমলকাকু ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হাসছিলেন, কিন্তু দীপু কাঁদতে লাগলো। কেন তার খেলনা ভেঙে দেওয়া হলো! অমলকাকু বললেন, ঠিক আছে, রাস্তায় যেতে যেতে আর একটা ডাল কুড়িয়ে নিলেই তো হবে। কিন্তু দীপু সে কথা শোনে না। সে তো যে-কোনো গাছের ডাল নেয় না। এই ডালটা ঠিক ছোট-মামার মতন ছিল, এটার কেন হাত ভাঙলো, ঠিক এই রকম একটা আবার তার চাই।

বাবা শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে এক ধমক দিয়ে বললেন, তুমি তো বড্ড বিরক্ত করছো। ঐ রকম করলে সব কটা ফেলে দেবো। যাও, চুপ করে গাড়িতে বসে থাকো।

দীপু গাড়িতে গিয়ে মুখ নীচু করে বসে রইলো। সারাটা রাস্তা আর কারুর সঙ্গে কথা বললো না।

কলকাতায় ফিরে আবার সব ঠিক হয়ে গেল। দীপু তার খেলনাগুলো সাজিয়ে রেখেছে নিজের ঘরে। তার স্কুল খুলতে এখনো কয়েকদিন দেরি আছে। খেলনার গাছের ডাল, পাথর, রাংতা কাগজ কিংবা পাখির পালক—এই সবকিছুই যেন তার চোখে জ্যান্ত। সে প্রত্যেককে একটা কিছু নাম দিয়ে এদের সঙ্গে কথা বলে। এদের মধ্যে আছে নানান চেনাশুনো আত্মীয় স্বজন, স্কুলের বন্ধু, জগন্নাথ, নেপোলিয়ান, ক্যাপ্টেন হ্যাডক, অরণ্যদেব, ভীম, অর্জুন, এইসব। দীপু অনেক সময় আপন মনে এদের সঙ্গে এত জোরে জোরে কথা বলে যে পাশের ঘর থেকে মা পর্যন্ত চমকে ওঠেন।

দুপুরবেলা মা শুনতে পেলেন, দীপু বলছে, বাবা, তুমি সিগারেট খাবে? দেশলাই এনে দেবো?

দীপু যেন সত্যিই তার বাবার সঙ্গে কথা বলছে। মা চমকে উঠে এ ঘরে এসে বললেন, কার সঙ্গে কথা বলছিস? তোর বাবা কোথায়? অফিস থেকে ফিরেছে নাকি?

দীপু আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললো, ঐ তো বাবা!

মা দেখলেন, একটা পুরোনো ব্যাডমিণ্টনের র‍্যাকেটের জালের ফাঁকে কাগজ পাকিয়ে সিগারেটের মতন আটকে রেখেছে দীপু। সেইটাকেই বাবা বলছে।

মা আজ আর রাগ করলেন না, হাসলেন। তারপর বললেন, তোকে নিয়ে আর পারি না। আচ্ছা, তোর আর কোন্ কোন্ খেলনা কার মতন দেখতে শুনি তো।

দীপু পর পর সব কটা শুনিয়ে গেল। এমনকি সেই ভাঙা ডালটাও সে এখনো ফেলেনি। মা সবচেয়ে বেশী হাসলেন একটা কালো পাথরের নাম সুতপা মাসী শুনে। সুতপা মাসীর গায়ের রং দারুণ ফর্সা।

তারপর মা জিজ্ঞেস করলেন, আমার মতন দেখতে কোন্‌টা রে? আমি কোন্‌টা?

দীপু মাকে জড়িয়ে ধরে বললো, তোমার মতন দেখতে একটাও পাই নি মা। কত খুঁজেছি, তবুও পাই না।

সেদিন বিকেলবেলা বাবা অফিস থেকে ফিরে গম্ভীরভাবে মাকে বললেন, তোমার দাদা ফোন করেছিলেন, একটা খারাপ খবর আছে।

মা ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি খবর? কি হয়েছে?

বাবা বললেন, অনন্তপুর থেকে খবর এসেছে, কেষ্টর একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।

অনন্তপুর গ্রামেই দীপুরা বেড়াতে গিয়েছিল। আর কেষ্ট হচ্ছে ছোটমামার ডাক নাম। তিনি ঐ গ্রামেই থেকে গিয়েছিলেন।

মা চোখ-মুখে ভয় ফুটিয়ে বললেন, কি হয়েছে কেষ্টর?

বাবা বললেন, কেষ্ট গাছ থেকে পড়ে গেছে। ঐ রোগা চেহারা নিয়ে কেষ্ট জোর করে একটা নারকেল গাছে উঠেছিল। নারকেল গাছে কি আর যে-সে উঠতে পারে। অনেক উঁচু থেকে পড়ে গেছে শুনলাম।

—কোথায় লেগেছে?

—খুব জোর বেঁচে গেছে। মাথায় কিছু হয়নি। কিন্তু একটা হাতে খুব জোর চোট লেগেছে। কালকেই নিয়ে আসা হচ্ছে কলকাতায়।

তারপর এই নিয়ে অনেক কথা হলো। মা সারা সন্ধে চিন্তা করতে লাগলেন তাঁর ভাই সম্পর্কে। শুধু চিন্তা নয়, তাঁর মনের মধ্যে একটা খটকা লেগে রইলো। কি রকম যেন একটা অস্বস্তি।

মা এসে একবার দীপুর ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ালেন। দীপু তখনও একমনে কথা বলে যাচ্ছে তার খেলনাদের সঙ্গে। সে তখন কর্ণ সেজে যুদ্ধ করছে অর্জুনের সঙ্গে। মা দূর থেকে দাঁড়িয়ে

একটুক্ষণ দেখলেন। কিছু একটা বলি বলি করেও বললেন না। একবার তাকালেন সেই ভাঙা ডালটার দিকে। তাঁর ভুরু কুঁচকে রইলো অনেকক্ষণ।

এর তিনদিন বাদে দীপু স্নান করছে ছুপুরবেলা, মা রান্না ঘরে, বাড়ির ঝি ঘর-দোর সব মুছচে, এমন সময় দীপুর পড়ার ঘর থেকে দড়াম করে একটা শব্দ হলো।

বাথরুম থেকেই সেই শব্দ শুনতে পেয়ে দীপু চেঁচিয়ে উঠলো, কি হলো? কি ভাঙলো?

কোনো উত্তর না পেয়ে দীপু ভিজে গায়েই ছুটে এলো নিজের ঘরে। এসে দেখলো, বাড়ির ঝি ছ'টুকরো ভাঙা পাথর হাতে নিয়ে বোকার মতন দাঁড়িয়ে আছে।

দীপু চিৎকার করে বললো, রাধামাসী, তুমি আমার খেলনা ভেঙে ফেললে?

রাধামাসী বললো, কি জানি বাবা! মা বললেন ঘরটা মুছে দিতে। এই পাথরটা মেঝে থেকে টেবিলের ওপর তুলে রাখতে যাচ্ছিলাম, আপনি আপনি কি রকম পড়ে ভেঙে গেল।

দীপু কান্না মেশানো অভিযোগের সঙ্গে বললো, আপনি আপনি আবার কিছু পড়ে যায় নাকি!

মা রান্নাঘর থেকে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে? কি হয়েছে?

দীপু বললো, ছাখো না, মা! ঠাকুমাকে ছ'টুকরো করে দিয়েছে!

মা একটু কেঁপে উঠলেন। তারপর বললেন, এসব আবার কি অলুক্ষণে কথা! চুপ কর্।

দীপু তবু বললো, তোমরা কেন আমার সব খেলনা ভেঙে দেবে?

মা হঠাৎ রাধামাসীকে খুব বকতে লাগলেন। একটু দেখে-শুনে কাজ করতে পারো না? সব সময়ই তো এটা ভাঙছো সেটা ভাঙছো।

রাধামাসী গজগজ করে উঠে বললো, একটা সামান্য পাথর, তাও আপনা আপনি পড়ে গেল টেবিল থেকে—তাতেও আমার দোষ বলো।

সেইদিনই সন্ধেবেলা এলাহাবাদ থেকে টেলিগ্রাম এলো। দীপুর ঠাকুমা হঠাৎ মারা গেছেন।

এলাহাবাদে দীপুর জ্যাঠামশাইরা থাকেন। ঠাকুমাও কয়েক-মাস আগে সেখানে গিয়েছিলেন।

টেলিগ্রামটা পেয়ে বাবা ধপ করে বসে পড়লেন। কান্না-কান্না গলায় বললেন, সামনের সপ্তাহেই মাকে নিয়ে আসবো ভেবেছিলাম। মায়ের সঙ্গে আর দেখা হলো না!

এই সময় মা এত জোরে কেঁদে উঠলেন যে বাবা পর্যন্ত চমকে উঠলেন। তারপর বাবা উঠে এসে মায়ের পিঠে হাত রেখে বললেন, তুমি অত ভেঙে পড়ো না। আমার বাক্স গুছিয়ে দাও। আমি আজই রাত্রের ট্রেনে এলাহাবাদ রওনা হবো!

মা বাবার হাত চেপে ধরে বললেন, আমার ভয় করছে? আমার ভীষণ ভয় করছে।

বাবা বললেন, ভয় কি? কয়েকটা দিন তুমি একা থাকতে পারবে না?

মা বললেন, সে জন্য না। তোমার মনে আছে, দীপুর খেলনা সেই গাছের ডালটা যখন ভেঙেছিল, তখন দীপু কি বলেছিল?

—কি বলেছিল?

—তোমার মনে নেই? দীপু বলেছিল, ছোটমামার হাত ভেঙে গেল যে! তারপর সত্যি সত্যি কেষ্টর হাত ভাঙলো। তারপর আজই দুপুরে, ও যে খেলনাটাকে ঠাকুমা বলে, সেটাকে ঝি ভেঙে দিয়েছে।

বাবা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দু'এক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বললেন, যাঃ, এসব কি বলছো! এ আবার হয় নাকি!

মা ব্যাকুলভাবে বললেন, সত্যি যে মিলে যাচ্চে !

বাবা বললেন, মিললেই বা কি হয়েছে ! একে বলে কাকতালীয়। এই থেকেই মানুষের কুসংস্কার জন্মায়।

বাবা চলে গেলেন এলাহাবাদ। এই ক'দিন মা দীপুকে সব সময় চোখে চোখে রাখলেন। তাকে আর বেশী খেলতে দেন না। সব সময় নিজের কাছে এনে জোর করে পড়তে বসান।

বাবা এলাহাবাদ থেকে ফিরে এলেন ক'দিন বাদেই। মাথা ন্যাড়া করেছেন। অফিস থেকে ছুটি নিয়েছেন আরও কয়েকদিন। দুপুরবেলা বাড়িতেই থাকেন। দীপুর ইস্কুল খুলে গেছে।

বাবা ঠাকুমার একটা ছবি বাঁধিয়ে এনেছেন সেদিন সকালে। ছবিটা তাঁর শোওয়ার ঘরের দেওয়ালে টাঙাবেন। পেরেক ঠোকার জন্য একটা শক্ত কিছু দরকার। বাড়িতে হাতুড়ি টাতুড়ি নেই। বাবা এ ঘর সে ঘর খুঁজতে খুঁজতে দীপুর পড়ার ঘর থেকে একটা বড় পাথর পেয়ে গেলেন। এটাতেই কাজ চলবে।

বাবা পেরেকটা ঠুকছেন, এমন সময় মা দৌড়ে এসে বললেন, একি, তুমি একি করছো ! ওটা রেখে দাও।

বাবা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন, কেন, কি হয়েছে ?

—তুমি দীপুর খেলনা নিয়েছো ?

—তাতে কি হয়েছে ? পাথর দিয়ে পেরেক ঠুকতে পারবো না।

— ও খুব ভালোবাসে খেলনাগুলো। এটা যে ওর অমলকাকু !

পেরেকটা তখন ঠোকা হয়ে গেছে। বাবা বললেন, ঠিক আছে, আমি রেখে দিচ্ছি। আবার ঠিক জায়গায় রেখে দিলেই তো হলো। পাথর তো আর ক্ষয়ে যায়নি।

মা বাবার হাত থেকে পাথরটা নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। তারপর বললের, এই দ্যাখো, মাঝখানটা কি রকম খুবলে গেছে !

বাবা বললেন, মাঝখানটায় একটা চলটা উঠে গেছে শুধু। ও দীপু কিছু বুঝতে পারবে না। যাও, পাথরটা রেখে এসো।

মা তবু সেটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, অনেকদিন অমলের কোনো খবর নেই। এ বাড়িতেও আসে নি।

বাবা বললেন, হুঁ, বেশ কিছুদিন অমলের পাত্তা নেই বটে। আমিও এলাহাবাদে ছিলাম। এসেও খোঁজ নেওয়া হয়নি!

মা বললেন, তুমি এক্ষুনি ফোন করো!

মায়ের গলার আওয়াজটা এমনই অন্যরকম যে বাবা অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। ফোন তুললেন।

—হ্যালো, অমল?

—কে, প্রশান্ত? কি খবর?

—তোর খবর কি? অনেকদিন পাত্তা নেই।

—ক'দিন খুব সর্দি কাশী আর জ্বরে ভুগছিলাম।

—এখন ভালো আছিস?

অমলকাকু সব কথাতেই হাসেন। এবারেও হাসতে হাসতে বললেন, আজ এক্স রে রিপোর্ট পেলাম। বুকটা একটু জখম হয়েছে ভাই। ডাক্তার বলছে, আমার প্লুরিসি হয়েছে।

মা আর বাবা দু'জনেই এক সঙ্গে চেঁচিয়ে বললেন, অ্যাঁ!

টেলিফোন রেখে দিয়েই বাবা একেবারে রেগে আগুন হয়ে উঠলেন। অমলকাকু তাঁর খুবই প্রিয় বন্ধু। মা তখনও সেই বুকের কাছে চলটা-ওঠা পাথরটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন।

বাবা বললেন, তোমার ছেলের এই সাংঘাতিক খেলা বন্ধ করতেই হবে।

মা বললেন, দীপুর দোষ কি? আমরাই তো ওর খেলনাগুলো ভেঙে দি কিংবা নষ্ট করি।

বাবা বললেন, তা বলে জ্যান্ত মানুষের নাম নিয়ে একি অদ্ভুত খেলা। একটার পর একটা বিপদ ঘটে যাচ্ছে।

বাবা রেগে গেলে আর কারুর কথা শোনেন না! দীপুর ঘরে

ঢুকে তিনি সব পাথরের টুকরোগুলো ছুঁড়ে ফেলতে লাগলেন পেছনের মাঠে। গাছের ডাল, কঞ্চি ভাঙা, ব্যাডমিণ্টনের র‍্যাকেট এগুলোও ফেলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ মত বদলে বললেন, এগুলো সব আমি আগুনে পুড়িয়ে দেবো।

দীপু তখন ইস্কুলে। তার সব খেলনা শেষ হয়ে যেতে লাগলো। বাবা তার সব গাছের ডাল আর কঞ্চিগুলো গুঁজে দিতে লাগলেন রান্না ঘরে জ্বলন্ত কয়লার উনুনে।

ভাঙা ব্যাডমিণ্টনের র‍্যাকেটটাও যখন উনুনে দিতে যাচ্ছেন, তখন মা তাঁর হাত চেপে ধরে ব্যাকুলভাবে বললেন, ওটা দিও না, ওটা থাক, ওটা দিও না।

বাবা সেকথা শুনলেন না। জোর করে র‍্যাকেটটা ভরে দিলেন উনুনে।

তখুনি উনুন থেকে একটা আগুনের শিখা লাফিয়ে উঠলো। আগুনের জিভ ছুঁয়ে দিল বাবার পাঞ্জাবীর হাতা। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। মা চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই কোনোক্রমে তিনি উনুন থেকে টেনে তুললেন র‍্যাকেটটা।

আগুন বেশী ছড়ায় নি। বাবার হাতটা শুধু একটু ঝলসে গিয়েছিল, বেশী কিছু হয়নি, মলম লাগাতেই সেরে গেছে।

বাবা দীপুর জন্য অনেকগুলো পুতুল ও মূর্তি কিনে দিয়েছেন। যেমন, বিবেকানন্দ, নেপোলিয়ান, বুদ্ধ, কৃষ্ণ, যীশুখৃষ্ট, সৈন্য, নাবিক, শিকারী, রবীন্দ্রনাথ, শিবাজী এইসব—অর্থাৎ যাঁরা কেউ এখন বেঁচে নেই।

●

ছোটমামার ব্যাপারটা

ছোটমামা আড়ষ্ট গলায় বললেন, ঐ ছাখ নীলু।

সামনের দিকে তাকিয়ে আমি হেসে ফেললাম। একটা খুবই নিরীহ চেহারার কুকুর। একদম নেড়ি কুত্তা ; যাকে বলে, রোগা, লম্বাটে, মুখখানা ভীতু-ভীতু। এই কুকুরকে দেখেও ছোটমামার ভয়। অথচ মজা এই যে ছোটমামা জানোয়ারে ভীষণ ইন্টারেস্ট, যদি সেটা খাঁচার জানোয়ার হয়। এখনও এই বয়সে প্রতি মাসে একবার করে চিড়িয়াখানায় যাওয়া চাই।

গ্রামের রাস্তা, কাদায় একেবারে চটচটে। ছু'পাশে মাঠ, মাঝখান দিয়ে উঁচু রাস্তা। প্রত্যেক বছরই বোধহয় রাস্তাটায় নতুন মাটি ফেলা হয়, আর বর্ষার সময় সেই মাটি আস্তে আস্তে গলে ধুয়ে যায়। গরুর গাড়ি ছাড়া এ রাস্তায় কিছু চলে না।

যখনকার কথা বলছি, তখন আমার বয়স উনিশ আর ছোটমামার বয়স পঁয়তিরিশ। ছোটমামার ছিপ-ছিপে লম্বা চেহারা, চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা, সাদা ধুতি-পাঞ্জাবী ছাড়া কক্ষনো কিছু পরতেন না। অদ্ভুত তাঁর বইয়ের নেশা। ঠিক পছন্দ মতন বই পেলে তা নিয়ে ছোটমামা সারাদিন ভুলে থাকতে পারেন। আর জানোয়ারের বই হলে তো কথাই নেই। নাওয়া খাওয়ার কথাও মনে থাকে না।

সে দিনটার কথা আমি কোন দিন ভুলব না।

মুর্শিদাবাদ জেলার সালার নামে এক রেল স্টেশনে নেমে আমরা ছু'জনে যাচ্ছিলাম সাত মাইল দূরের এক নবাব-বাড়িতে। আসল নবাব নয়, তাদেরই হয়তো দূর সম্পর্কের কোন আত্মীয়। কিংবা অনেক ছোটখাট মুসলমান জমিদারদেরও লোকে নবাব

বলত। যেমন অনেক হিন্দু জমিদারের বাড়িকেই লোকে বলত রাজবাড়ি।

এই নবাব-বাড়িতে অনেক পুরোন বই আছে শুনেছিলাম। আগেকার দিনে নবাবরা চিতাবাঘ-টিতাবাঘ পুষত, তাই ছোটমামার বিশ্বাস, এ বাড়িতেও জানোয়ারের বই থাকা আশ্চর্য নয়। আমরা যাচ্ছিলাম সেই বইয়ের খোঁজে।

গরুর গাড়ি ছাড়া এই সাত মাইল পথ যাবার আর কোন ব্যবস্থা নেই। অন্তত তখন ছিল না। গরুর গাড়িটা আমার খুব পছন্দ নয়। ছোটমামাও বলেছিলেন, ফেরার সময় বইপত্র নিয়ে তো গরুর গাড়িতে আসতেই হবে ; চল, এখন হেঁটেই যাই।

পথের মধ্যে সেই কুকুর। গ্রামের রাস্তায় এরকম একটা হুটো কুকুর তো থাকবেই। ছোটমামাকে নিয়ে বাইরে বেরুনোর এই এক মুস্কিল।

ছোটমামা যেমন কুকুরটাকে দেখে ভয় পেয়েছেন, কুকুরটাও সেই রকম আমাদের দেখে ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে।

ছোটমামা বললেন, নীলু, কুকুরটাকে তাড়া।

আমি বললাম, ও কিচ্ছু করবে না। আমরা এগোলেই ও সরে যাবে।

উহুঃ! পাগলা কুকুর হতে পারে। দেখছিস না, ল্যাজ ঝোলা।

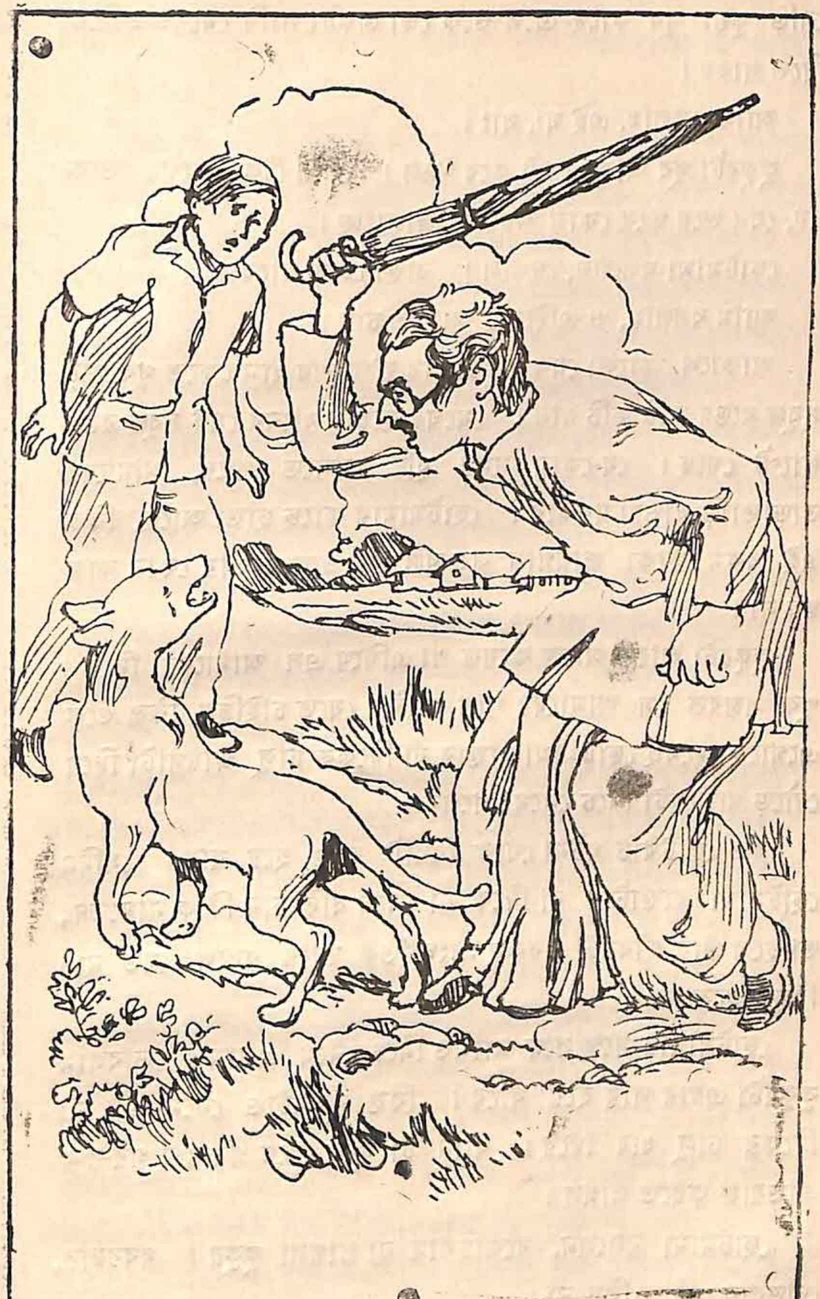
ভয় পেলে সব কুকুরেরই ল্যাজ ঝুলে যায়।

জিভ বার করে আছে।

হাঁপিয়ে গেছে বোধ হয়। কুকুর জিভ বার করে দম নেয়।

কুকুর কামড়ালে জলাতঙ্ক হয় জানিস? নেড়ি কুত্তা কামড়ালেও হয়, বুলডগ কামড়ালেও হয়।

কুকুরের ব্যাপারে আমিও যে খুব একটা সাহসী তা নয়। অনেক জায়গায় খুব বড় সাইজের অ্যালসেশিয়ান, গ্রেটডেন বা ডবারম্যান জাতীয় কুকুর দেখলে আমারও বুক ধড়ফড় করে। কিন্তু একটা রোগা



নেড়ি কুত্তা খুব কাছে এলে ওকে তো একটা লাথি মেরেও হটিয়ে দিতে পারব।

আমি বললাম, এই যা, যাঃ।

কুকুরটা খুব আস্তে ঘেউ করে উঠল। সেটা ঠিক রাগের ডাক নয়, যেন ভয়ে ভয়ে কোন অনুরোধ জানাচ্ছে।

ছোটমামা বললেন, দেখলি! রাস্তা ছেড়ে যাবে না।

আমি বললাম, ও এদিকেই আসতে চায়।

আকাশে কালো মেঘ। রাস্তার দু'পাশের ধান ক্ষেতে খুব গাঢ় সবুজ রঙের কচি কচি ধান। মেঘের ছায়ায় ধানের সেই সবুজ রঙও পাল্টে গেছে। যে-কোন সময় বৃষ্টি আসতে পারে, আমাদের তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার। ছোটমামার কাছে ছাতা আছে, কিন্তু এই রকম ফাঁকা জায়গায় ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলে ছাতায় কোন কাজ হয় না।

কুকুরটা আস্তে আস্তে কয়েক পা এগিয়ে এল আমাদের দিকে। খুব সম্ভবত সে আমাদের পাশ কাটিয়ে যেতে চাইছিল, কিন্তু ওকে এগোতে দেখেই ছোটমামা রাস্তার বাঁ-দিকের ঢালু জায়গাটা দিয়ে দৌড়ে খানিকটা নিচে নেমে গেলেন।

কত ছোটখাট ঘটনা থেকে বিরাট কাণ্ড হয়ে যায়। সেদিন ছোটমামা রাস্তাটার বাঁ-দিকে না নেমে যদি ডান দিকে নামতেন, তা হলে তাঁর জীবনটা এরকম সাংঘাতিক ভাবে বদলে যেত না। কিছুই হতো না।

ছোটমামার সঙ্গে সঙ্গে আমিও নিচে নেমে এলাম। ভাবলাম কুকুরটা এবার পার হয়ে যাবে। কিন্তু কুকুরটাও নেমে এল বাঁ দিকের ঢালু ধার দিয়ে। খানিকটা দূরত্ব রেখে গর-র-র গর-র-র আওয়াজ করতে লাগল।

ছোটমামা বললেন, বলেছিলাম না পাগলা কুকুর। খবরদার, দৌড়বার চেষ্টা করিস না।

আমার তখনও কুকুরটা পাগলা বলে বিশ্বাস হচ্ছিল না। কারণ কুকুরটার মুখ-চোখে রাগের ভাব নেই। গলা দিয়ে আওয়াজ করছে বটে, কিন্তু সেটাও বেশ নরমভাবে।

আমরা দু'জনে কুকুরটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলাম। আমাদের পেছন দিকে একটা ঝোপ। সামনে খানিকদূরে একটা নোংরা জলের ডোবা। কাছাকাছি কোন বাড়ি-ঘর বা মানুষ-জন নেই।

কুকুরটা সেইরকম আওয়াজ করতে করতে এক পা এক পা করে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসতে লাগল। ছোটমামা ছাতাটা বাগিয়ে ধরলেন। আমি 'হুস, হাস, যাঃ' বলতে লাগলাম।

খুব ভীতু লোকেরাও একসময় খুব সাহসী হয়ে ওঠে। কুকুরটা আর একটু কাছাকাছি আসতেই ছোটমামা নিজে দু'পা এগিয়ে ছাতাটা ওর পিঠে খুব জোরে এক ঘা কষালেন।

কুকুরটা প্রচণ্ড আর্তনাদ করে উঠল। কিন্তু উল্টে আমাদের আক্রমণ না করে সে পেছন ফিরে প্রাণপণে দৌড় মারল।

ছোটমামা বীরের মতন বললেন, দেখলি, ব্যাটাকে দিয়েছি ঠাণ্ডা করে।

কিন্তু ততক্ষণে আর একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেছে। কুকুরটা খুব জোরে পালাতে গিয়ে হুড়মুড় করে পড়ল সেই ডোবাটার মধ্যে! জলের মধ্যে দাপাদাপি করল একটুক্ষণ, তারপর হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে গেল আবার। কুকুরটা ঘাড় কাৎ করে ভাসছে, আর তার চোখ দুটো দেখলে মনে হয়, মরে গেছে।

আমরা হতবাক। কুকুর কখনো জলে ডোবে না, সব জন্তু-জানোয়ারই জন্ম থেকে সাঁতারু। তাহলে কুকুরটা মরে গেল কেন? তা হলে কি ছোটমামার ছাতার ঘা খেয়েই মরে গেল? কিন্তু সব নেড়ি কুত্তাই তো খুব মারধোর খায়, এক ঘা ছাতার বাড়ি খেয়ে তার তো কিছু হবার কথা নয়।

আমরা ডোবাটার কাছে এগিয়ে গিয়ে ভাল করে দেখলাম।

কুকুরটা যে মরে গেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ছোটমামা আর আমি চোখাচোখি করলাম কয়েকবার, কিছুই বুঝতে পারলাম না আমরা। ছোটমামার নরম মন, তাঁর মুখখানা কাঁদো কাঁদো হয়ে গেছে। তিনি কুকুরটাকে মেরে ফেলতে চান নি মোটেই।

এমন হতে পারে যে কুকুরটা খুব বুড়ো হয়ে গিয়েছিল। ও যে কোন সময় মরতে পারত। ছাতার ঘা খেয়ে ভয় পেয়ে জলের মধ্যে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে হার্ট ফেল করেছে।

এই সময় কুঁই কুঁই শব্দ পেয়ে আমরা আবার চমকে পেছন ফিরে তাকালাম। ঝোপটার আড়াল থেকে তুরতুরে পায়ে বেরিয়ে আসছে তিন-চারটে কুকুরছানা। তখন সব ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। ঐ কুকুরটা আমাদের তাড়া করে আসেনি। ও ওর বাচ্চাদের কাছে আসতে চাইছিল। আমরাই-বা সেটা বুঝব কী করে? সব কুকুরকেই আমরা কুকুর বলি, কিন্তু ওটা ছিল কুকুরী। ছানাগুলো ঘুমোচ্ছিল বোধহয়, আওয়াজ শুনে জেগে উঠেছে।

আমাদের খুব মন খারাপ হয়ে গেল। মা মরে গেল, এখন বাচ্চাগুলোর কী হবে? আমরাই-বা এখন কী করব? নবাব-বাড়িতে যাচ্ছি, সেখানে তো আর কয়েকটা নেড়ি কুত্তার বাচ্চা কোলে করে নিয়ে যাওয়া যায় না।

এমন সময় টপাটপ ফোঁটার বৃষ্টি নামল। বিদ্যুৎ চমকের সঙ্গে বাজ ডাকল একবার। ছোটমামা বললেন, এবার চল, ওরা ঠিক বেঁচে যাবে। এক মত হয়ে আমিও উঠে এলাম রাস্তার ওপরে। মনে হল যেন মরা কুকুরীটা তখনও আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

খানিকটা যেতে না যেতেই শুরু হলো ঝড়। আকাশের এদিক থেকে ওদিক চিরে যেতে লাগলো বিদ্যুতে। আর কী অসম্ভব জোরে বজ্রের আওয়াজ। ফাঁকা মাঠের মধ্যে এই আওয়াজ যে কত সাংঘাতিক তা সেদিনই বুঝেছিলাম। মনে হয় যেন একটা বিশ্বযুদ্ধ লেগে গেছে।

হাঁটবার বদলে আমরা প্রায় দৌড়োতে শুরু করেছি। রাস্তার ধারে একটা খেজুরগাছ দেখে ছোটমামা বললেন, আয়, এখানে একটু দাঁড়াই।

আমি বললাম, না, এখনো জোরে বৃষ্টি নামেনি। চল, সামনে কোন গ্রাম-ট্রাম পাওয়া যাবে।

সঙ্গে সঙ্গে বিরাট জোরে একটা বাজ পড়ল। আমি চোখ বুজে কান ঢেকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। একটু পরে চোখ মেলে দেখি, ছোটমামা খেজুরগাছটার কাছেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছেন। আর গাছটার রং হয়ে গেছে কালো।

আমার বুকের মধ্যেও যেন একটা বাজ ডেকে উঠল। বজ্রপাতে মানুষ মরে যাবার কথা শুনেছি। তবে কী তাই হলো? ছুটে গেলাম ছোটমামার কাছে। পিঠে হাত রেখে বললাম, ছোটমামা!

ছোটমামা চোখ মেলে বললেন, কী?

আমি একটা মস্ত বড় নিঃশ্বাস ফেললাম। আমার মাথায় যেন ঠাণ্ডা বাতাস লাগল। এত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আমি।

ছোটমামা, তোমার কিছু হয়নি তো?

না তো! আমি রাস্তায় শুয়ে আছি কেন?

পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলে বোধহয়। উঠতে পারবে?

হ্যাঁ, কেন পারব না?

ছোটমামা নিজে উঠে দাঁড়ালেন। ছাতাটা ছিটকে একপাশে পড়ে গিয়েছিল, সেটাকে তুলে নিলাম। আমার জন্য অপেক্ষা না করেই হনহন করে হাঁটতে শুরু করলেন ছোটমামা। আমি এগিয়ে গিয়ে দু'একটা কথা বলার চেষ্টা করলাম, ছোটমামা কোন উত্তর দিলেন না। মুখখানা অসম্ভব গম্ভীর।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় আমি চমকে উঠলাম। ছোটমামার চোখে চশমা নেই। অথচ চশমা ছাড়া উনি ভাল দেখতে পান না। হাঁটতে পর্যন্ত অসুবিধে হয়।

ছোটমামা, তোমার চশমা ?

ভুরু কুঁচকে ছোটমামা বললেন, চশমা! আমার চশমা ছিল, তাই না! সেটা কোথায় গেল ?

আমি দেখছি।

দৌড়ে ফিরে গেলাম খেজুরগাছটার কাছে। একটু খুঁজতেই চশমাটা পাওয়া গেল। ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলাম, ছোটমামা, তোমার সত্যি কিছু হয় নি ? শরীর ঠিক আছে তো ?

কোন উত্তর না দিয়ে আমার কাছ থেকে চশমাটা নিয়ে ছোটমামা আবার হাঁটতে শুরু করলেন।

যে রকম মেঘ ডাকছিল, সেই তুলনায় জোর বৃষ্টি হল না। আমরা সন্ধ্যের একটু আগেই পৌঁছে গেলাম নবাব-বাড়িতে।

সে-বাড়ি দেখলে কান্না পায়। একসময় নিশ্চয়ই দারুণ ব্যাপার ছিল, এখন অনেকখানি জায়গা জুড়ে পড়ে আছে একটা ভগ্নস্তূপ। সিংহদ্বারের একটা সিংহ এখনো টিকে আছে, অন্যদিকে কিছুই নেই। কোথাও দাঁড়িয়ে আছে শুধু একখানা দেয়াল, কোথাও একখানা দু'খানা ঘর আস্ত আছে, কিন্তু দরজা জানলা নেই। মনে হয়, সাত মহলা না হলেও তিন চার মহলা প্রাসাদ ছিল। এখন এই ভাঙাচুরো বাড়ির মধ্যেও কিন্তু অনেক লোক আছে। জোড়াতালি দিয়ে থাকে, কেউ এ বাড়ি সারাবার কথা চিন্তা করে না।

একটু খোঁজ করতেই নবাবকে পাওয়া গেল। বর্তমান নবাবের বয়েস খুব কম। বাইশ তেইশ বছর মাত্র, নবাবী-চাল কিছু নেই। প্যান্ট-শার্ট পরা সাধারণ কলেজের ছাত্রদের মতন মনে হয়। বেশ হাসি-খুশি। ছোটমামার কাছে হাইকোর্টের জজ ইউসুফ সাহেবের একটা চিঠি ছিল। সেটা দেখে তরুণ নবাব বললেন, বইপত্র সব প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে, উইপোকায় শেষ করে দিয়েছে। আপনারা দেখে ইচ্ছে মতন যে-কটা খুশি নিতে পারেন। আমি শিগগির

পাকাপাকিভাবে বিলেত চলে যাচ্ছি, তাই যা আছে সব বিলিয়ে দিয়ে যেতে চাই।

গোটা একটা বাড়িতে নাকি ছিল লাইব্রেরী। আশ্চর্যের ব্যাপার, সে বাড়িটা কিন্তু এখনো পুরোপুরি ভেঙে যায় নি। দু'তিনখানা ঘর এখনো প্রায় আস্তই আছে। একটা ঘরে ঢুকে দেখলাম, বইপত্র একেবারে পাহাড় হয়ে আছে। খুব সম্ভবত আগে এ ঘরে বড় বড় আলমারি বা কাঠের র‍্যাক ছিল। কেউ একজন তার থেকে সব বইগুলো বার করে মেঝেতে ফেলে সেই আলমারি আর র‍্যাক বিক্রি করে দিয়েছে। অধিকাংশ বই-ই ছিঁড়ে কুটিকুটি।

ছোটমামা আন্দাজে ভুল করেননি। জানোয়ারের বইও বেরুল দু-একখানা। অতিকষ্টে গোটা চারেক বই আমরা বেছে নিতে পারলাম। বাকি আবার কাল সকালে দেখব বলে বেরিয়ে এলাম। ধুলো আর ভ্যাপসা গন্ধে ভরা ঐ ঘরের মধ্যে বেশীক্ষণ থাকলে দম আটকে আসে।

অবস্থা খারাপ হয়ে গেলেও নবাব-বাড়ির আতিথ্য এখনো বেশ উঁচুদরের। ছোটমামার জামা-কাপড়ে কাদা লেগে গিয়েছিল বলে ওঁকে দেওয়া হল একটা সিল্কের লুঙ্গি আর একটা ভাঁজ ভাঙা পাঞ্জাবী। রাত্রে খাওয়া-দাওয়াও জমল বেশ, তিনরকম কাবাব আর ঘি চপচপে পরোটা। থাকার জন্য একটা ঘরও পাওয়া গেল। সেখানটায় একতলার সব ঘর আবর্জনায় ভর্তি, কিন্তু সিঁড়ি আর দোতলার একটা ঘর অটুট আছে। সেখানে পাশাপাশি দু'খানা খাটে পরিষ্কার চাদর পাতা। নবাব নিজে এসে আমাদের জন্য ব্যবস্থা করে গেলেন। আমাদের খুবই অসুবিধে হবে বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন বারবার। আমরা খুব 'না' 'না' বলতে লাগলাম। আমি একাই কথা বললাম অবশ্য, ছোটমামাও সেই বিকেলের পর থেকে কথা বলছেন খুব কম।

ইলেকট্রিসিটি নেই, একটা হারিকেন রাখা হয়েছে আমাদের ঘরে। ছোটমামা সেই টিমটিমে আলোতেই একটা বই খুলে বসেছেন। কিছুক্ষণ বই না পড়ে ছোটমামা ঘুমোবেন না আমি জানি। কিন্তু আমার ঘুম পেয়ে গেছে। আবার বৃষ্টি পড়তে শুরু হয়েছে, আর সারারাত বৃষ্টি পড়লেও কোন ক্ষতি নেই, ঘুমটা জমবে ভালো। অবশ্য বেশী বৃষ্টি হলে এই বাড়িটা না ধ্বসে পড়ে।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ একটা বিশ্রী শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। কেউ যেন একটা মাটির হাঁড়ির মধ্যে মুখ দিয়ে আওয়াজ করছে। এত রাত্রে এ রকম ইয়ার্কি কে করে? পাশ ফিরে দেখলাম নিজের খাটের ওপর সোজা হয়ে বসে ছোটমামা এক মনে বই পড়ছেন।

ছোটমামা শুধু আমার দিকে একবার তাকালেন। কোন উত্তর দিলেন না। পড়ার সময় ডিসটার্ব করা পছন্দ করেন না ছোটমামা। আমি ভাবলাম, তা হলে ঘুমের মধ্যে নিশ্চয়ই আমি ভুল শুনেছি। পাতলা ঘুমের মধ্যে এরকম অনেক অদ্ভুত আওয়াজ শোনা যায়।

আবার চোখ বুঁজলাম। কিন্তু কিসের যেন একটা গন্ধ পাচ্ছি। খুব খারাপ গন্ধটা। অথচ একটা চেনা-চেনা। যাই হোক, ঘুমোবার চেষ্টা করলাম জোর করে। গন্ধটা যেন বেড়েই যেতে লাগল। এবার চিনতে পারলাম। ছোটমামার সঙ্গেই চিড়িয়াখানায় গেছি কয়েকবার, সেখানে বাঘ-সিংহের খাঁচার সামনে এরকম গন্ধ পাওয়া যায়। সেই রকমই বোটকা গন্ধ। তখন মনে হল, একটু আগে যে আওয়াজটা শুনেছিলাম, সেটাও যেন বাঘের ডাকের মতন।

তক্ষুনি আবার সেই রকম বাঘের ডাক শোনা গেল। একেবারে ঘরের মধ্যে। ধড়মড় করে উঠে বসে দেখলাম, সামনে খোলা বইখানির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছোটমামা আওয়াজ করছেন উম্মা! উম্মা! অবিকল বাঘের মতন। ঘরটাতে অসম্ভব বোটকা গন্ধ।

ভয়ে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এলেও আমি ডাকলাম, ছোটমামা!

ছোটমামা ডাক থামিয়ে আমার দিকে তাকালেন। একদম অন্যরকম মুখ। অসম্ভব হিংস্র। গলা দিয়ে গ-র-র-র আওয়াজ বেরুচ্ছে।

ছোটমামার বদলে অন্য কোন লোক হলে আমি কী করতাম জানি না। কিন্তু ইনি তো আমার নিজের ছোটমামা। খাট থেকে লাফিয়ে উঠে ছোটমামাকে ধাক্কা দিয়ে বললাম, ছোটমামা! ছোটমামা! কী হয়েছে? তোমার কী হয়েছে?

তাকিয়ে দেখলাম, ছোটমামার সামনের খোলা বইটাতে একটা বাঘের ছবি।

কিছু না ভেবেই আমি বইটা বন্ধ করে দিলাম।

ছোটমামা অমনি সাধারণ গলায় বললেন, কিছু হয়নি তো! তুই অমন করছিস কেন?

তুমি ওরকম শব্দ করছিলে কেন? ঘরে কিসের গন্ধ?

কই, কিছু না তো! আমি তো গন্ধ পাচ্ছি না।

আমি ভয়ে ভয়ে খাটের তলা দেখলাম। কিন্তু দোতলার ওপর খাটের নিচে তো বাঘ লুকিয়ে থাকতে পারে না! তাছাড়া আওয়াজটা ছোটমামাকেই করতে শুনেছি। ছোটমামা আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছেন? না মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

ছোটমামা হাই তুলে বললেন, আমিও এবার শুয়ে পড়ব।

হারিকেনটা কমিয়ে রাখা হল খাটের পাশে। ছোটমামা একটু পরে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে নীলু, কুকুরটাকে কি আমিই মেরে ফেললাম?

আমি বললাম, না, অত সহজে কি কুকুর মরে?

হয়তো আমার ছাতার ঘায়ে ওর শিরদাঁড়া ভেঙে গিয়েছিল। তাই জলে পড়ে গিয়ে···

আমার তা মনে হয় না। ওর নিশ্চয়ই মরবার সময় হয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ গলার আওয়াজটা বদলে ফেলে ছোটমামা হুংকার দিয়ে বললেন, বেশ করেছি মেরেছি। একটা পাগলা কুকুর তেড়ে এলে মারবো না?

আমার ছোটমামা বরাবরই শান্ত স্বভাবের মানুষ। কোনদিন এরকম দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে কথা বলেন না। কিন্তু এ সবের চেয়েও আমি বাঘের ডাকটার কথা বেশী চিন্তা করছিলাম। ছোটমামা এরকম বাঘের মতন ডাকতে পারেন? কোন দিন শুনিনি আগে। ছোটমামা আমায় ভয় দেখাতে চাইছিলেন? তাহলে বাঘের গায়ের বোটকা গন্ধ আমি পেলাম কী করে? ওটাও কি আমি মনে মনে কল্পনা করেছি? গন্ধটা এখনো ঘর থেকে যায়নি পুরোপুরি।

রাতে আর কিছু হল না। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই ছোটমামা বললেন, চল, আমরা এখান থেকে চলে যাই।

আমি বাঘের প্রসঙ্গটা একটু তুলতে যেতেই ছোটমামা বললেন, তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখেছিস! এই মুর্শিদাবাদে বাঘ? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

একটু বেলা হতেই তরুণ নবাব এলেন আমাদের খোঁজখবর নিতে। চা খাবার পর বললেন, চলুন, বই দেখতে যাবেন না?

ছোটমামার কোন উৎসাহ দেখলাম না। বইয়ের ঘরে ঢুকেও ছোটমামা চুপ করে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন, একটা বইও ছুঁয়ে দেখলেন না। যে ছোটমামা বইয়ের পোকা, যাঁর জন্য এতদূরে আসা? আস্ত দেখে পঁচিশ-তিরিশখানা বই বেছে নিয়ে বললাম, ব্যস, যথেষ্ট হয়েছে। কয়েকটা বাণ্ডিলে বেঁধে নিলাম বইগুলো।

ফেরার পথে আমরা এলাম গরুর গাড়িতে। নবাবকে প্রচুর

ধন্যবাদ দিয়ে আমরা উঠে পড়লাম সেটাতে। বিদায় নেবার সময় ছোটমামা একটাও কথা বললেন না। আমার খুব লজ্জা করছিল।

আগের দিন যেখানে সেই ঘটনাটা ঘটেছিল, সে জায়গাটা মনে ছিল আমার। রাস্তার ওপর থেকেই নিচের সেই ডোবাটা দেখা যায়। মরা কুকুরটা এখনো জলে ভাসছে। বাচ্চাগুলোকে কোথাও দেখতে পেলাম না। আমার পাশে তাকিয়ে দেখলাম, ছোটমামা চোখ বন্ধ করে আছেন, আর বিড় বিড় করে কী যেন বলছেন। ছোটমামার ব্যবহার দেখে আমি রীতিমতন চিন্তায় পড়ে গেছি। কলকাতায় ফিরেই ডাক্তার দেখাতে হবে। সামান্য একটা কুকুরকে মারা নিয়ে কী যেন হয়ে গেল। তাও তো ইচ্ছে করে মারা হয়নি। কিংবা ঐ যে বাজের আওয়াজে ছোটমামার অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, সেই জন্যই এসব হচ্ছে। কিন্তু কুকুরটার জন্য এখানে দেরি না হলে বাজ পড়বার আগেই অনেকটা চলে যেতাম।

স্টেশনে এসে মিনিট পনেরোর মধ্যে আমরা পেয়ে গেলাম একটা ট্রেন। উঠে পড়লাম টিকিট কেটে। আমাদের কামরায় খুব বেশী ভিড় নেই। একটাই মাত্র জানলার ধারে সীট ছিল, সেটা ছোটমামাকে দিয়ে আমি বসলাম পাশে। ছোটমামা আবার চোখ বুজে বিড়বিড় করতে লাগলেন।

আধঘণ্টাখানেক বাদে ছোটমামা আবার চোখ মেলে গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন, অনেকক্ষণ বসে থাকতে হবে। দে তো একটা বই পড়ি।

আমি খুশি হয়ে তাড়াতাড়ি একটা বইয়ের বাণ্ডিল খুলতে গেলাম। ছোটমামা অন্য একটা বাণ্ডিলের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন, ওর থেকে তিন নম্বর বইটা দে।

একটা চওড়া মতন বই, জার্মান ভাষায় লেখা, ভেতরে অনেক জন্তু-জানোয়ারের ছবি। বইটা ছোটমামার দিকে এগিয়ে দিলাম।

ছোটমামা বইখানা মাঝখানের একটা পাতা উল্টেই চোখ বিস্ফারিত করে ফেললেন। একটা অদ্ভুত চীৎকার করে বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন কামরার মেঝেতে।

কামরার সবাই আমাদের দিকে তাকাল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী হল, ছোটমামা ?

ছোটমামা কুকুরের মতন ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠলেন। নকল কুকুরের ডাক নয়। ঠিক যেন একটা আসল কুকুর ডাকছে।

বহু লোক ভিড় করে এল আমাদের দিকে। ছোটমামা তখনও ডেকে চলেছেন। কেউ কেউ ব্যাপারটাকে ঠাট্টা মনে করে হাসতে লাগল। আমার যেন লজ্জায় মাথা কাটা গেল। আমি ঝুঁকে ছোটমামার হাত ধরে বললাম, কী হয়েছে ছোটমামা, এরকম করছ কেন ?

ছোটমামা খ্যাঁক করে আমার হাত কামড়ে ধরলেন দারুণ জোরে। অন্য লোকেরা এসে তাড়াতাড়ি না ছাড়িয়ে দিলে ছোটমামা বোধহয় আমার হাতের মাংসই তুলে নিতেন। আমাকে ছাড়বার পরই ছোটমামা অন্যদের কামড়াতে গেলেন, তখন সবাই ছোট-মামাকে দমাদম করে মারতে শুরু করল।

এ রকম অবস্থায় আমি জীবনে কখনো পড়িনি। আমার কান্না পেয়ে গেল। আমার ছোটমামাকে অন্য লোকে মারছে। আমি ঝাঁপিয়ে পড়ে ছোটমামাকে আড়াল করে কাতর গলায় বললাম, ছেড়ে দিন, দয়া করে ছেড়ে দিন।

ছোটমামা তখনই আবার স্বাভাবিক গলায় বললেন, কী হয়েছে রে নীলু! লোকগুলো এমন ক্ষেপে গেল কেন ?

একজন লোক মাটিতে ওল্টানো বইটা তুলে এনে দিল আমার হাতে। খোলা পাতাটায় একটা কুকুরের ছবি।

অনেক লোক তখনো বলতে লাগল, নামিয়ে দিন, লোকটাকে নামিয়ে দিন। আমি হাত জোড় করে সকলের কাছে ক্ষমা

চাইলাম। ছোটমামা বারবার অসহায়ভাবে বলতে লাগলেন, লোকগুলো এত রাগ করছে কেন? কী হয়েছে?

আমার হাত থেকে রক্ত বেরুচ্ছিল। আমি সেখানে একটা রুমাল চাপা দিয়ে বললাম, কিচ্ছু হয়নি। তুমি চোখ বুজে থাক।

আমাদের কাছাকাছি আর কোন লোক বসল না।

হাওড়া স্টেশনে পৌঁছলাম ভালভাবেই। ট্রেনের ছ'জন সহযাত্রী আমার প্রতি দয়া করে একটা ট্যাক্সি ডেকে দিলেন। বেশ শান্তভাবেই ট্যাক্সিতে উঠলেন ছোটমামা। এমনকি লোক ছুটিকে নমস্কার করে ধন্যবাদ জানালেন। ট্যাক্সি চলতে শুরু করার পর আমাকে বললেন, বেশ ভাল লোক তো ওরা। এবার বেড়ানোটা তেমন ভাল হল না, সকাল থেকে মাথাটা ঝিমঝিম করছিল কেমন যেন।

আমি বললাম, রাত্তিরে ভাল ঘুম হয়নি বোধহয়। বাড়ি গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

তুই ভাল বই এনেছিস তো? আমার আর কিছু দেখা হল না।

হ্যাঁ, ভাল বই আছে কয়েকটা।

দেখি, দে তো।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বইগুলো আড়াল করে বললাম, না, এখন নয়, বাড়িতে গিয়ে দেখবে।

ছোটমামা আর জোর করলেন না। বললেন, সত্যি রে, আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

আমরা তখন থাকি মোমিনপুরের কাছে। ট্যাক্সিটা চলছে খুব আস্তে আস্তে। হঠাৎ পাশেই একটা ডুমডুম আওয়াজ পেলাম। ছোটমামা চোখ বুজে ছিলেন। অমনি আবার চোখ মেলে খাড়া হয়ে বসলেন। আমি দেখলাম, আমাদের ট্যাক্সির পাশ দিয়ে একজন বাঁদর-নাচওয়ালা চলেছে ছুটো বাঁদর নিয়ে।

ছোটমামা মুখ দিয়ে ছু'বার হুপহুপ করে ঝট্ করে ট্যাক্সির

দরজা খুলে নেমে গেলেন রাস্তায়। তারপর লাফাতে লাগলেন, সেই বাঁদর দুটোর পাশে। আর অবিকল একটা গোদা বাঁদরের মতন দাঁত-মুখ খিঁচোতে লাগলেন বাঁদরওয়ালার দিকে।

একটা দারুণ হৈ-চৈ পড়ে গেল। কলকাতার রাস্তায় ভিড় জমতে এক মিনিট দেরি হয় না। তা ছাড়া এমন দৃশ্য, একজন ধুতি-পাঞ্জাবী পরা লোক বাঁদরের মতন শব্দ করছে আর লাফাচ্ছে !

ছোটমামাকে সেখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল ঠিকই। তারপর তাঁর চিকিৎসা করা হয়েছে। কোন ডাক্তার তাঁর মধ্যে পাগলামির কোন চিহ্ন খুঁজে পান নি। কিন্তু তাঁর পাগলামি দিন দিনই বাড়তে লাগল। এমনিতে ছোটমামা খুব চমৎকার স্বাভাবিক মানুষ। কিন্তু কোন জন্তু-জানোয়ার দেখলে কিংবা বইতে কোন জন্তু-জানোয়ারের ছবি, এমনকি নামটা দেখলেও তিনি বদলে যান। অমনি সেই জন্তুটির লক্ষণ তাঁর মধ্যে ফুটে ওঠে। কোন ওষুধে কোন কাজ হল না।

শেষ পর্যন্ত ছোটমামাকে রাখা হল মধুপুরের একটা ফাঁকা বাড়িতে। সে বাড়িতে কোন ছাগল বা বেড়ালও ঢুকতে দেওয়া হয় না। ছোটমামা সর্বক্ষণ অঙ্ক বা জ্যামিতির বই পড়েন। গল্পের বই পড়া একেবারে বন্ধ। কারণ আমি দেখেছি, বাংলা বা ইংরেজীতে এমন কোন গল্পের বই নেই, যেখানে একবার না একবার কোন না কোন জন্তু-জানোয়ারের উল্লেখ থাকে না। একবার একটা বইতে শুধু 'বিড়ালের মতন সতর্ক' এই লাইনটা পড়েই ছোটমামা বেড়াল ডাক ডাকতে শুরু করেছিলেন।

আমার মনে হয়, পশুসমাজের কোন আলাদা ব্যবস্থা আছে। তারাই কোন রহস্যময় উপায়ে ছোটমামার ওপরে এরকম প্রতিশোধ নিয়েছে। যদিও জানি, আমার এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে না।

অবশ্য মধুপুরে গিয়ে যে কেউ আমার ছোটমামাকে এখনো দেখে আসতে পারে।

আর একটা কথাও আমার প্রায়ই মনে হয়। সেদিন কেন সেই মাটির রাস্তাটার বাঁদিকে না নেমে ডান দিকে নামলাম না আমরা ? তাহলেই তো সব ঠিকঠাক থাকত।

লাল জঙ্গলে

এক

চান করবার জন্যে বাথরুমে ঢুকলেই দিপুর প্রায় এক ঘণ্টা লেগে যায়। মা, বাবা, দিদি ব্যস্ত হয়ে ওঠে। এই সময়ে সকলেরই ইস্কুল-কলেজ-অফিস যাওয়ার তাড়া। এখন কি বেশিক্ষণ বাথরুম আটকে রাখলে চলে ? দিদি আর মা ঘুরে ফিরে বাথরুমের দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলেন, এই দিপু, তোর হলো ? এতক্ষণ কী করছিস ? এইবার বেরো।

দিপু কোনো উত্তর দেয় না।

বাথরুমে ঢুকলেই দিপু নানারকম স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। স্বপ্ন তো যে-কোনো জায়গাতেই দেখা যায়। তবু, বাথরুমের ছোট্ট ঘরটায় দরজা-জানলা বন্ধ করে জেগে জেগে স্বপ্ন দেখার যেন বেশি সুবিধে হয়। মাথার ওপরের শাওয়ারটা খুলে দিয়ে সে সামনের সাদা দেওয়ালের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। তখন দেওয়ালটা হয়ে যায় ছায়াছবির পর্দা। দিপু তার ওপরে মনে মনে সিনেমা বানায়।

কল্পনায় দিপু সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে আকাশে উড়ে বেড়াতে। প্লেনে, হেলিকপটারে বা প্যারাস্যুটে নয়, এমন কি পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চেপেও নয়। দিপু নিজেই একটা উড়ন্ত যান তৈরি করে ফেলেছে মনে মনে। কাগজে সেই উড়ন্ত যানটার ছবিও সে এঁকেছে অনেকবার। বড়মামাদের বাড়িতে দিপু একটা পোরসিলিনের বাথটাব দেখেছিল। পুরোনো আমলের জিনিস, বাইরেটা বেশ কারুকার্য করা। দিপুর উড়ন্ত যানের তলাটা ঠিক ঐ বাথটাবের মতন, আর ওপরটা কাচ দিয়ে ঢাকা। সেই

কাচের দেয়াল প্রায় দু'মানুষ লম্বা, ভেতরে সিঁড়ি আর দুটি জানলা আছে।

দিপু যখনই ইচ্ছে করে তখনই এই উড়ন্ত যানটা তার কাছে এসে উপস্থিত হয়। তারপর সে ঘুরতে বেরোয়। কোনোদিন এভারেস্টের চূড়ায়, কোনোদিন সমুদ্রের বুকে কোনো দ্বীপে।

মনে মনে উড়ে বেড়াতে বেড়াতে দিপু বুঝতে পারে যে ভূগোল বইতে বা ম্যাপে কোনো উল্লেখ নেই এমন অনেক জায়গাই এখনো পৃথিবীতে আছে। যেমন, এই তো গতকালই দিপু নেপালের ওপর দিয়ে উড়তে উড়তে ধওলাগিরি শৃঙ্গ পেরিয়ে একটা উপত্যকা দেখতে পেল, যেখানে সব ক'টা গাছের রং লাল। এর আগে কেউ তো পুরোপুরি লাল রঙের একটা জঙ্গলের কথা বলেনি।

দিপু অনেকক্ষণ ছিল সেই উপত্যকায়।

সেই জঙ্গলে দিপু অতিকায় পাখির মতন এক ধরনের রহস্যময় প্রাণীও দেখতে পাচ্ছিল, কিন্তু বেশিক্ষণ দেখা হলো না। তার আগেই দিদি ধাক্কা মেরে দিল বাথরুমের দরজায়।

কল্পনার জগতে যে কোনো ম্যাপ থাকে না, সেইটাই যা মুস্কিল। তার পরের দিন দিপু আর সেই লাল জঙ্গলটা খুঁজে পায় না। তার রকেট চালিয়ে সে নেপালের পাহাড়ী উপত্যকায় অনেক ঘোরাঘুরি করলো কিন্তু সেই লাল জঙ্গলের কোনো চিহ্নই নেই। সেটা কোথায় হারিয়ে গেছে।

শুধু বাথরুমে কেন, স্কুলের ক্লাসে বসে কিংবা ঘুড়ি ওড়াবার জন্য ছাদে গিয়েও দিপু এমন অনেক কিছু দেখতে পায় যা অন্য কেউ দেখে না। যেমন সে একদিন দেখেছিল তাদের ভূগোলের টিচারের দুটি ডানা আছে।

ভূগোলের টিচার জ্যোতিপ্রকাশ বাবু পড়ান বেশ ভালো, কিন্তু মানুষটি কেমন যেন অদ্ভুত। তিনি ক্লাসে পড়ানো ছাড়া আর একটাও অন্য কথা বলেন না। কখনো হাসেন না। প্রায়ই জানলা

দিয়ে তাকিয়ে থাকেন বাইরের দিকে। যেন তাঁর মন পড়ে আছে অন্য কোথাও।

দিপু একদিন দেখলো, ছুটির পর জ্যোতিপ্রকাশবাবু স্কুলের পেছনের দিকে দোতলার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। আস্তে আস্তে তাঁর দু'হাতের পাশ দিয়ে দুটি ডানা ফুটে বেরুলো। বেশ বড় ডানা। বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের মতন। গরুড়ের যেমন ডানা আছে, হাতও আছে, সেই রকম।

ভূগোলের টিচারের সেরকম ডানা দেখে সে আশ্চর্য হয়নি। এরকম তো হতেই পারে!

কিন্তু জ্যোতিপ্রকাশবাবু সেই ডানা মেলে ওড়বার উদ্যোগ করে একবার পেছন ফিরে তাকালেন। অমনি দিপুর সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হয়ে গেল।

তিনি সঙ্গে সঙ্গে গলা খাঁকারি দিয়ে ডানা গুটিয়ে ফেললেন, তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন নিচে।

দিপু ঠিক করেছিল, ভূগোলের স্যারের সঙ্গে এই ডানার বিষয়ে একদিন আলোচনা করবে। তিনি যদি শিখিয়ে দেন যে কী করে ডানা গজাতে হয়, তা হলে বেশ হয়।

কিন্তু দিপু সে সুযোগ আর পেল না। কয়েকদিন পর থেকেই জ্যোতিপ্রকাশবাবু স্কুলে আসা একেবারে বন্ধ করে দিলেন। তারপর জানা গেল তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন। তাঁর বাড়ির লোকও কেউ বলতে পারে না যে তিনি কোথায় চলে গেছেন বা কোথায় যেতে পারেন। পুলিশে খবর দিয়েও কোনো লাভ হলো না।

একমাত্র দিপু জানে ভূগোলের টিচারের কী হয়েছে। জ্যোতিপ্রকাশবাবু মাঝে মাঝেই গোপনে ডানা মেলে অনেক দূরে দূরে বেড়াতে যেতেন। একদিন ঐরকম কোথাও গিয়ে ফেরার রাস্তা হারিয়ে ফেলেছেন। কিংবা এবারে যেখানে গেছেন সেই জায়গাটাই এত পছন্দ হয়ে গেছে যে আর ফিরে আসতে মন চাইছে না।

এই কথা বললে অবশ্য কেউ বিশ্বাস করবে না। দিপুকে ভাববে পাগল কিংবা গুলবাজ। কিন্তু দিপু যে একদিন নিজের চোখে ভূগোলের টিচারের ডানা বেরুতে দেখেছে।

আর একদিন দিপু ছাদে বসে আছে একা। গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। দুটো শালিক কার্নিসে বসে কিচির-মিচির করছে। বিকেল হয়ে আসছে, আকাশের মেঘ রং বদলাচ্ছে। দিপু প্রায়ই এই সময়টায় আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। তার ধারণা, হঠাৎ মেঘের আড়ালে কোনো একদিন একটা কিছু দেখা যাবে।

সেরকম কিছু দেখতে পেল না অবশ্য, কিন্তু একসময় সে শুনতে পেল, একটা শালিক আর একটা শালিককে বলছে, আর বলিস না··· আর বলিস না, ঐ ছেলেটা সব বুঝতে পেরে যাবে।

দিপু চমকে তাকালো। শালিকরা ঐ কথা বলছে কেন? সে কী বুঝতে পারবে? শালিকদের বুঝি গোপন কথা থাকে?

তারপর সে আরও চমকে গেল এইজন্য যে, শালিকটা মানুষের ভাষায় কথা বলে উঠলো কী করে?

সে উঠে দাঁড়াতেই শালিক দুটি তার দিকে তাকিয়ে ঠিক যেন মুচকি হেসে পিড়িং করে উড়ে গেল।

দিপু খানিকক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইলো। শালিকরা মানুষের ভাষা শিখে নিতে পারে? মানুষের কাছাকাছিই তো ওরা থাকে। রোজ মানুষের কথা শোনে। কিন্তু কোন্ জিনিসটা ওরা দিপুর কাছ থেকে গোপন করতে চাইছিল।

এই ঘটনাটাও দিপু কারুকে জানাতে পারেনি। যে কেউ শুনলেই বলবে, দিপু ভুল শুনেছে।

এইসব রহস্যময় ব্যাপারের চেয়েও বাথরুমের দেয়ালটাকে সিনেমার পর্দার মতন করে নিয়ে দিপু যখন কল্পনার জগতে উড়ে যায়, তখন সে অনেক বেশি আনন্দ পায়।

তার বাথটাবের মতন আকাশ-যানটিকে সে এক-একদিন

নতুনভাবে সাজায়। কাচের গোল ঘরটাতে আগে সিঁড়ি ছাড়া আর কিছু ছিল না। একদিন সে সিঁড়িটার গায়ে লতানে গাছ জড়িয়ে দিল। লাল গাছ নয় অবশ্য, সবুজ।

চার্লি-চ্যাপলিনের একটা পোস্টার-ছবি দিপুর খুব প্রিয়। একদিন সেই ছবিটাকে ও রকেটে নিয়ে নিল।

দুই

দিপুর একটা মুস্কিল হয়ে গেল পূজোর ছুটিতে।

বাবা সবাইকে নিয়ে বেড়াতে গেলেন মধ্যপ্রদেশে। মা, বাবা, দিদি আর সে। ছোটমামা দণ্ডকারণ্যে চাকরি নিয়েছেন, তিনিই নেমন্তন্ন করেছেন।

দিপুর অবশ্য ট্রেনে বেড়াতেও খুব ভালো লাগে। সবচেয়ে ভালো লাগে রাত্তির বেলা। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ছুটে যায় ট্রেন। সামনে কী আছে কেউ জানে না। রাত্তির বেলা চলন্ত ট্রেনে ঘুম আসে না, দিপু জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকে বাইরে।

রায়পুরে নেমে নেওয়া হলো একটা জিপ। তারপর অনেক দূরের পথ। যেতে যেতে জঙ্গল, পাহাড় কত কী পার হয়ে যেতে হলো।

প্রায় গোটা একবেলা পার করে ওরা পৌঁছলো জগদলপুরে। সেখানে ছোটমামা অপেক্ষা করছিলেন।

এককালে বাস্তার নামে একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। এই জগদলপুর ছিল তার রাজধানী। এখন তো আর রাজাদের রাজত্ব নেই, আর বাস্তার এখন মধ্যপ্রদেশের একটি জেলা। জগদলপুরকে দেখেও আগেকার রাজধানীর কিছুই চেনা যায় না, শুধু পুরোনো দু'একটা বাড়ি চোখে পড়ে।



শহরটা দেখে বাবার পছন্দ হলো না। তিনি ছোটমামাকে বললেন, এ কোথায় নিয়ে এলে? এই যে শুনেছিলুম তুমি মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে থাকো?

ছোটমামা হেসে বললেন, জঙ্গলে থাকলে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনীয়ারের চাকরি করা যায়? ঠিক আছে, চিন্তা করবেন না। জামাইবাবু, আপনাদের জন্য আমি জঙ্গলে থাকারই ব্যবস্থা করে রেখেছি!

জগদলপুরে দু'দিন থেকে ওরা চলে এলো সেখান থেকে বাইশ মাইল দূরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে এক বাংলোতে। বাংলোটি বেশ সুন্দর। সামনে বাগান, পেছন দিকে পাহাড়।

জায়গাটা সকলেরই বেশ পছন্দ হলো, অসুবিধে হলো শুধু দিপুর। এই বাংলোর সবই ভালো, শুধু বাথরুমটা অন্ধকার।

আগেকার দিনের তৈরি বাড়ি, বাথরুমটাও শোওয়ার ঘরের মতন বড়। কিন্তু তাতে জানলা নেই। ওপরের দিকে আছে স্কাই-লাইটের কাচ। কিন্তু ক'দিন ধরেই আকাশ মেঘলা বলে আলো আসে না। এ বাংলোতে ইলেকট্রিসিটিও নেই যে লাইট জ্বালা যাবে।

স্নান করতে গিয়ে দিপু বাথরুমের দেয়ালের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু দেয়ালটা ভালো দেখা যায় না বলে সেটা সিনেমার পর্দা হয়ে ওঠে না।

স্নানের আগে কিছুক্ষণ বাথটাবের মতন আকাশ-যানে কিছুক্ষণ শূন্যে উড়ে আসা দিপুর অভ্যাস। এখন আর সেটি হচ্ছে না। দিপু কিছুতেই তার আকাশ-যানকে দেখতে পাচ্ছে না। এমনকি চোখ বুঁজলেও সে দেখতে পায় না।

এর জন্য দিপুর যে কী কষ্ট তা অন্য কেউ বুঝবে না!

একদিন গেল, দু'দিন গেল, তৃতীয় দিন তো সারাদিনই টিপির টিপির বৃষ্টি। দিপুর মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গেছে। অন্য কারুর সঙ্গে তার কথা বলতেই ইচ্ছে করছে না।

বৃষ্টির দিনে দিদি স্নান করে না। বাবাও বাদ দিয়ে দেন। সুতরাং বাথরুম বেশিক্ষণ আটকে রাখলে কোনো অসুবিধেই নেই। কিন্তু স্নান করতে এসে দিপুর কান্না পেয়ে গেল।

বাথরুমের দরজাটা বন্ধ করলে এমন অন্ধকার হয়ে গেল যে দিপু প্রায় নিজেকেই দেখতে পায় না, দেয়াল দেখবে কী? আজও সে উড়তে পারবে না! আকাশ-যানটা কি কলকাতা ছেড়ে বাইরে এসে আর দিপুর দখলে থাকবে না?

দিপু সেই অন্ধকারের আবছা দেয়ালের সামনেই দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর খুব মন দিয়ে আকাশ-যানটার কথা ধ্যান করতে লাগলো। ওকে আসতেই হবে এখানে।

কিন্তু কিছুতেই আসছে না। দিপু দেয়ালে কোনো ছবি দেখতে পাচ্ছে না।

বাথরুমের দরজাটা খুলে দিল, তাতে একটু আলো হলো। দিপু আবার তীব্র মনোযোগ দিয়ে তার বাথটাব আকাশ-যানটার কথা চিন্তা করতে লাগলো বেশ খানিকক্ষণ ধরে। তাতেও সে ব্যর্থ হলো। নোনাধরা দেয়ালটাতে শুধু ফাটা-ফাটা দাগ, তাতে কোনো ছবিই ফোটে না।

সেদিন দুপুর তিনটের সময় খেয়ে-দেয়ে সবাই যখন একটু শুয়েছে, দিপু একা বেরিয়ে পড়লো বাংলো থেকে। বৃষ্টি এখনো পড়ছে, তবু দিপুর ভ্রূক্ষেপ নেই। কেউ যেন তাকে ডাকছে, যেতেই হবে।

বাংলোটার সামনের রাস্তা পেরুলেই জঙ্গল। প্রথমে পাতলা পাতলা, তারপর গভীর।

দিপু ঢুকে পড়লো সেই জঙ্গলের মধ্যে। দূরে দড়্‌দড়্‌ করে জলের শব্দ হচ্ছে। ওখানে একটা ছোট ঝর্না আছে। সেখানেই যেন যেতে হবে দিপুকে।

ঝর্নার কাছে জঙ্গলটা একটু ফাঁকা। দিপু দূর থেকে দেখলো, ঝর্নার পাশে তার বয়েসী একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে।

দিপুর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ছেলেটি হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকলো।

আরো কাছে গিয়ে দিপু দারুণ অবাক হয়ে বলে উঠলো, এ কি!

ছেলেটি শুধু যে দিপুর সমবয়েসী তাই-ই নয়, তাকে অবিকল দিপুর মতনই দেখতে। মাথার চুল থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত পুরোপুরি মিল আছে।

ছেলেটি একটু হেসে বললো, কেমন আছো দিপু?

দিপু বললো, তুমি...তুমি..মানে..তুমি কে? আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

ছেলেটি বললো, মোটেই স্বপ্ন দেখছো না। গায়ে চিমটি কেটে ভাখো। আমি তোমার প্রতিভাস!

দিপু বললো, তার মানে?

ছেলেটি বললো, তুমি প্রতিভাস গ্রহের নাম শোনো নি? তোমরা, পৃথিবীর মানুষরা বড্ড পিছিয়ে আছো?

দিপু তবু কিছু বুঝতে পারছে না। সে অনেক অদ্ভুত, অলৌকিক দৃশ্য দেখে, কিন্তু এটা সে মেনে নিতে পারছে না কিছুতেই। ছেলেটি কি অন্য গ্রহ থেকে এসেছে? তা আসতে পারে। তাতে এত আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মানুষ চাঁদে পৌঁছে গেছে, কিছুদিন পরে অন্য গ্রহতেও যাবে। অন্যান্য গ্রহের মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণী থাকলে তারাও পৃথিবীতে আসতে পারে। কিন্তু এর চেহারা দিপুর মতন হবে কী করে? এমনকি পোষাক পর্যন্ত এক রকম।

ছেলেটি যেন দিপুর মনের কথা বুঝতে পারলো।

সে হেসে বললো, শুধু চেহারা আর পোষাকই এক নয়, আমার নামও দিপু।

দিপু বললো, তা হলে এটা নির্ঘাৎ স্বপ্ন।

ছেলেটি বললো, মোটেই স্বপ্ন নয়। তোমাদের পৃথিবীতে যা-

যা আছে, আমাদের প্রতিভাস গ্রহে অবিকল সেই সবই আছে। আমাদের অবশ্য দু'চারটে জিনিস আছে, সেগুলো তোমরা মাঝে মাঝে কল্পনা করে পুষিয়ে নিচ্ছো। যেমন···

ছেলেটি হঠাৎ থেমে গিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলো।

দিপুর প্রথমে একটু ভয় ভয় লাগছিল, এবারে সে এগিয়ে গিয়ে ছেলেটির গায়ে হাত রাখলো। হ্যাঁ, রক্ত-মাংসেরই মানুষ—স্বপ্ন নয়, ছায়া নয়।

দিপু বললো, ব্যাপারটা কী হচ্ছে, একটু বুঝিয়ে দাও তো।

অন্য দিপু বললো, অত বুঝে কী হবে? ধরে নাও না, ঠিক তোমার মতন, আর একজন কেউ অন্য কোথাও আছে। তোমার বাবার মতন, তোমার মা, দিদি, ছোটমামা সকলের মতনই এক একজন আমাদের ওখানে আছে।

—সত্যি?

—আমি তো মিথ্যে কথা বলতে এখানে আসিনি। বরং তোমাকে একটু সাহায্য করতে এসেছি।

—কী সাহায্য?

—আমার একটা শূন্যযান আছে, সেটা ঠিক বাথটাবের মতন দেখতে। ওপরে কাচের গোলঘর, ভেতরে সিঁড়ি।

—অ্যাঁ! কী বলছো তুমি?

—আমার ঐ শূন্যযানটিকে তুমি প্রায়ই কল্পনা করতে। আজ তুমি এমন তীব্রভাবে কল্পনা করছিলে যে আমার যানটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। জানো তো, খুব মন দিয়ে কোনো কিছু চাইলে তা ঠিকই পাওয়া যায়। তোমার জন্য ওটা আমি নিয়ে এসেছি!

—ওটা মানে?

—আমার বাথটাব আকাশ-যান। দেখবে এসো! দিপুর হাত ধরে অন্য দিপু নিয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে।

একটা ফাঁকা জায়গায় পড়ে আছে পোর্সিলিনের বিরাট একটা

বাথটাব, তার ওপরে কাচের গোলঘর। ভেতরে কাঠের সিঁড়ি, তাতে লতানো গাছ জড়ানো। কাচের দেয়ালে সাঁটা একটা চার্লি চ্যাপলিনের পোস্টার।

অন্য দিপু তার দরজা খুলে দিপুকে বললো, চলো, একটু ঘুরে আসা যাক।

দিপু বললো, এখনো বলছো আমি স্বপ্ন দেখছি না? তোমার আকাশ-যানে আমার ঘরের চার্লি চ্যাপলিনের ছবি কী করে এলো?

অন্য দীপু বললো, এটা এমন আর কী শক্ত কাজ! তুমি যে-যে জিনিস খুব বেশি চাও কল্পনায়, সেটা আমি তৈরি করে নিই। তোমাকেও সেরকম করতে হয়। যেমন, আমি যখন খুব কল্পনা করি যে কোনো পাখি মানুষের ভাষায় কথা বলছে, তখন তুমি সেটা সত্যি সত্যি শুনতে পাও।

—আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না।

—বিশ্বাসের দরকার নেই। কোথায় ঘুরে আসতে চাও বলো।

—তুমি আমাকে লাল জঙ্গল দেখাতে পারো?

অন্য দিপু চমকে উঠে বললো, আবার লাল জঙ্গল! একবার দেখেছিলে তাতে শখ মেটে নি।

—মোটে একটুখানি দেখেছিলুম।

—ঐ যথেষ্ট। না, লাল জঙ্গল থাক, চলো, অন্য কোথাও যাই। উত্তর মেরুতে যাবে?

—সেখানে তো খুব শীত! কেন, লাল জঙ্গলে যেতে চাইছো না কেন?

—সে বড় সাংঘাতিক জায়গা! সেখানে গেলে আর ফিরতে ইচ্ছে করে না। তুমি তো যাওনি, আমি গিয়েছিলুম একদিন, তুমি শুধু কল্পনায় দেখেছো। আমি অতি কষ্টে ফিরিয়ে এনেছি নিজেকে।

—সেখানে ভয়ের কী আছে? খুব বড় বড় পাখি দেখেছিলুম।

—ওগুলো পাখি নয়। লাল জঙ্গলে ভয়ের কিছু নেই। বিপদও নেই। কিন্তু কিছু একটা জাদু আছে। চুম্বকের মতন টেনে রাখে।

—যদি যেতে হয় তো আমি ওখানেই যাবো।

—তুমি দেখছি ঠিক আমারই মতন জেদী। চলো তা হলে। কিন্তু খুব সাবধান। যখন ফিরতে বলবো, তখনই ফিরবে।

দু'জনে ভেতরে ঢুকতেই আকাশ-যানটা আকাশে উঠে গেল। কোনো ইঞ্জিন নেই, মেশিনঘর নেই, ওটা ইচ্ছাশক্তিতে চলে।

জঙ্গল, পাহাড়, নদী পেরিয়ে সেটা মুহূর্তে বহু দূরে চলে গেল। বহু উঁচুতে উঠে তারপর আস্তে আস্তে নামতে লাগলো নিচের দিকে।

অন্য দিপু বললো, ব্যস, আর নয়। এবার চেয়ে ছাখো।

দিপু দেখলো, নিচের পাহাড়ী উপত্যকা থেকে একটা লাল আভা আসছে শুধু। গাছগুলোকে ভালো দেখা যাচ্ছে না।

দিপু বললো, আর একটু নিচে নামো।

—না থাক, আর দরকার নেই।

—গাছগুলোকে যে দেখতেই পাচ্ছি না।

—বেশি নিচে নামবো না কিন্তু।

আর-একটু নিচে নামার পর দেখা গেল বড় বড় গাছ। টক-টকে আগুনের মতন লাল তাদের পাতার রং। মাঝখান দিয়ে একটি নদী বইছে, তার জলের রং সোনালী। সেই নদীর ওপরে উড়ছে কয়েকটা খুব বড় বড় পাখি।

দিপু জিজ্ঞেস করলো, ওগুলো কী পাখি?

—ওটা পাখি নয়, মানুষ।

—অ্যাঁ! কী বলছো?

—ঠিকই বলছি। চলো, ফিরে যাই।

—না, আর একটু নিচে নামবো।

দু'জনের দু'রকম কথায় আকাশ-যানটা মজার ব্যবহার করতে

লাগলো। যেই একজন বলে ফিরে যাই, অমনি সেটা ওপরে উঠতে শুরু করে। আর যেই অন্যজন বলে, নিচে নামবো, অমনি আকাশ-যানটা আপনি আপনি নেমে যায় আবার।

একবার অনেকখানি নিচে নেমে এসে দিপু সেই মানুষ পাখিগুলোর মুখ দেখতে পেল। তার মধ্যে একটি মুখ তার খুব চেনা! তাদের সেই ভূগোল টিচার জ্যোতিপ্রকাশবাবু।

দিপু চেঁচিয়ে উঠলো, স্যার!

অন্য দিপু বললো, ডেকো না। ওদের সঙ্গে কথা বলতে নেই!

দিপু বললো, আমি নিচে নামবো। ওঁদের সঙ্গে কথা বলবো।

—না।

—হ্যাঁ, আমি যাবোই। আমি ফিরতে চাই না।

—তোমাকে লাল জঙ্গলের জাদুতে টেনেছে। ফিরে চলো।

—চুপ করো। তোমার কথা শুনতে চাই না।

আকাশ-যানটা ওদের কথা অনুযায়ী একবার উঠছে, একবার নামছে।

একবার খুব নিচে নেমে আসায় দিপু আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলো—আমি জিতে গেছি। আমি জিতে গেছি। এবারে আমরা লাল জঙ্গলের মাটিতে নামবো।

—তাহলে তোমার কল্পনাশক্তি নষ্ট হয়ে যাবে, তাই চাও?

—অ্যাঁ! কী বললে?

—এখানে কারুর স্মৃতি থাকে না। ঐ পাখি-মানুষগুলো ফেরার রাস্তা ভুলে গেছে সেইজন্য। এখানে কেউ কিছু কল্পনা করে না। এখানে বাথরুমের দেয়াল নেই।

দিপু বলে উঠলো, তা হলে নিচে নামবো না। এবার আমরা ফিরবো।

অন্য দিপুও চেঁচিয়ে উঠলো, ফিরবো, ফিরবো!

আকাশ-যানটা আবার শোঁ-শোঁ করে ওপরে উঠে গেল।

●

॥ কিশোর সাহিত্য ॥

লীলা মজুমদার (আশ্চর্য সত্য ঘটনা)	হাতি ! হাতি !	৮·০০
লীলা মজুমদার (রোমাঞ্চকর গল্প)	আরো ভূতের গল্প	৮·০০
লীলা মজুমদার (রহস্য ও অভিযানের গল্প)	ভূতোর ডায়রি	৬·০০
লীলা মজুমদার (মনোরম সব গল্প ও কাহিনী)	কুকুর এবং অন্যরা	৮·০০
অজেয় রায় (দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প)	আমাজনের গহনে	৬·০০
শিশিরকুমার মজুমদার (রহস্যে ভরা রোমাঞ্চকর কাহিনী)	কুঠিবাড়ির রহস্য	৯·০০
আশাপূর্ণা দেবী (চমৎকার হাসির গল্প)	নিখরচায় আমোদ	৮·০০
সুমথনাথ ঘোষ (মনোরম উপকথার গল্পগাথা)	পূর্ববাংলার রূপকথা	৭·০০
দিলীপ ভট্টাচার্য	চিতা বাঘের গল্প	৮·০০
অরুণ দে	নক্ষত্রের দেশে টুটুন	৮·০০
গৌরী সেন	নীলপদ্ম (যন্ত্রস্থ)	৭·০০
ঐ	সাপ রাজপুত্র (যন্ত্রস্থ)	